সীমানা ছাড়িয়ে

সৈয়দ শামসুল হক

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

১. মা মারা গেছেন যখন........2
২. জরিনার মা মারা গিয়েছিলেন........22
৩. এই সন্ধ্যার কথা........36
৪. যুদ্ধের দ্রুত কলকাতা........61
৫. কদিন আগে মাসুদের চিঠি........96
৬. শাহ সাদেক আলী বই পড়ছিলেন........112

১. মা মারা গেছেন যখন

মা মারা গেছেন যখন জরিনা মাত্র সাত। শিশু–মনে লেগে থাকা কবেকার কয়েকটা মাত্র ছবি, আর অ্যালবামে কয়েকটা ফটোগ্রাফ শুধু বেঁচে আছে। যখন তার তার বয়স বারো, তখন বাবা মাঝে মাঝে দেখাতেন সেই ছবিগুলো। বলতেন তার মায়ের কথা। বলতেন, যখন নতুন মা রোকসানা ঘরে থাকতো না, কিংবা কাছাকাছি। একটাতে এক মহিলা তার বাবার পাশে বসে আছেন। পাড় গার কাঠ চেঁছে রং মাখানো চ্যাপ্টা পুতুলের মতো। পেছনের পটভূমির সঙ্গে যেন সেই মহিলার কোনো দূরত্ব নেই। আরেকটা ছবিতে শুধু সেই মহিলা। লতার মতো লীলায়িত একটা ময়ূর পাড় ঘোমটা ঘিরে রেখেছে সেই কাঠ পুতুলের মুখ। কিন্তু ঠোঁট জোড়া ভারী, একটু কালো কালো ছবিতে কালো, আসলে হয়ত গোলাপি এখুনি হয়ত হাসবেন। তারপর অ্যালবামের আরো দুটো পাতা ওলটালে বড়ো ছবি। সেই মহিলা শাল গায়ে বসে আছেন ভারী কাজ করা উঁচু নকশাপিঠ চেয়ারে। পাশে দাঁড়িয়ে এগারো বছরের চালাক চালাক ছিপছিপে এক মেয়ে নূরুন্নাহার নতুন শাড়ি পড়েছে। এমন কি এও হতে পারে ওই ছবি তোলবার দিনই প্রথম সে শাড়ি পড়ল, তাই কেমন আড়ষ্ট। আর সেই মহিলার কোলে পাঁচ বছরের আরেকটি মেয়ে। হাঁ করে বোকার মতো তাকিয়ে আছে সমুখের দিকে। ঠোঁট ঝুলে পড়েছে। অপরূপ ভঙ্গিতে তাকে একহাতে জড়িয়ে ধরে আছেন সেই মহিলা।

কিন্তু ছবিগুলো জরিনা আর কোনোদিন দেখতে চায়নি। এখন তো একেবারেই নয়। বরং সে মনে না করতে পারলেই বাঁচে। সে স্মৃতি শুধু থেমে থাক, দৃষ্টি করলে যার প্রতিক্রিয়া

হয় না, সে স্মৃতি স্মৃতিই নয়। তার মনে যে মহিলা আছেন, সেই ভালো, যে মহিলা ঝুঁকে পড়ে তার পাঁচ বছরের কোকড়ানো কালো চুলে গাঢ় নীল রিবন বেঁধে দিচ্ছেন।

.

শাহ সাদেক আলী একবার হাসলেন রোকসানার দিকে তাকিয়ে। গলাটাকে যথাসম্ভব মোলায়েম করে বললেন, তোমার ওই দোষ। নিজের মতটাকে অন্যের ওপরে চাপিয়ে দিতে চাও। সে বেচারার যে কিছু বলার থাকতে পারে তোমার মনেই হয় না। রোকসানা বলেছিল, নতুন বাড়িতে দোরপর্দা হবে হালকা বাদামি রঙের। কিন্তু সাদেক বলেন, সবুজ। শুধু বলেই ক্ষান্ত হননি, গত পরশু সেই নির্দেশ দিয়ে এসেছেন ডেকোরেটর মোহাম্মদ সোলেমানকে। কিন্তু তাতেও দোষ হতো না, যদি পরশুদিনই তিনি কথাটা বলতেন রোকসানাকে। বলেছেন সবে আজ। রোকসানার রাগ এ কারণেই আরো কিছুটা উঁচু পর্দায়। আবার সে বললো, আপনি তাহলে–।

একটু চা দিও।

সাদেক আলী কলম তুলে প্যাডে লিখতে লিখতে বললেন। দশ বছরের বিবাহিত জীবনে রোকসানা এটুকু জেনেছে যে, এই কথার আড়ালে কী তিনি বলতে চান। তাই কথাটা দূরে দাঁড়ানো রোকসানার কানে গিয়ে বাজলো যেন থামো। তাকিয়ে রইলো সেই মানুষটার দিকে যে প্যাডে একটানা লিখে চলেছে দেশে খাদ্য সঙ্কটের ওপর বিবৃতি।

শাহ সাদেক আলী পছন্দ করেন না তার বিবৃতি লিখে দেবে কোনো মাইনে করা সেক্রেটারী অথবা তার পার্টির কোনো উমেদার, যারা অপেক্ষায় থাকে পার্টি কবে ক্ষমতায় আসবে, আর ক্ষমতায় এলেই যারা উঠে পড়ে লেগে যাবে, কীসে দুটো পয়সা করা যায়। এই সততাই সাদেককে অত্যন্ত সাধারণ স্তর থেকে তুলে এনেছে আজকের ঈর্ষাযোগ্য সামাজিক স্তরে, রাজনৈতিক খ্যাতির শিখরে। অবশ্য আজকের দিনে রাজনীতিতে খ্যাতি বলতে যা বোঝায় সে খ্যাতি কোনোদিনই তাঁর আসেনি, তিনিও চাননি।

জরিনার মা এসেছিলেন যখন, সাদেক তখনো ছাত্র। শ্বশুর পাঠালেন বিলেতে। বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরে এলেন। প্রাকটিস শুরু করলেন কলকাতা হাইকোর্টে। সে কতকাল আগের কথা। তারপর সারা ব্রিটিশ বাংলায় জেগে উঠলো মুসলমান সমাজ। মুসলিম মধ্যবিত্তের যেন মেরুদণ্ড গড়ে উঠলো মাত্র কয়েক বৎসরে। মেরুদণ্ড পেলেন শাহ সাদেক আলী। এই সময়ে এক মামলার ব্যাপারে যেতে হয়েছিল বম্বে। আর এই যাত্রাই তার জীবনে এনে দিলো এক নতুন মোড়। বম্বেয় তার সঙ্গে দেখা হলো মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর।

কলকাতায় ফিরে এসে সাদেক যোগ দিলেন রাজনীতিতে। সেদিন থেকে শুরু করে আজ আটান্ন বছর বয়স অবধি রাজনীতি তাঁর সাধনা হয়ে আছে। এর পেছনে তার প্রথমা স্ত্রী জরিনার মায়ের দানও কম নয়। কিন্তু জরিনার মা থাকতেন সকলের, এমনকি সাদেকেরও অলক্ষ্যে। তাই কোনদিনই তিনি বুঝতে পারেননি যে একজোড়া শুভ্র চোখ তাকে সারাক্ষণ উজ্জ্বল করে রেখেছে।

একদিন বড় অন্ধকার ঠেকল, যেদিন জরিনার মা মারা গেলেন। সেদিন তাঁর একটি অঙ্গচ্ছেদ হয়ে গেল যেন। সেদিন তিনি বিশেষ করে বুঝতে পারলেন কতখানি অবলম্বন তিনি পেয়েছিলেন তাঁর এই রাজনৈতিক জীবনে জরিনার মায়ের কাছ থেকে। কাজ আর কাজ কাজের অবিরাম প্রবাহে হঠাৎ একটা বিষম ধাক্কা খেলেন সাদেক। কিন্তু সামলে নিতে জানেন তিনি। তাই ওপর থেকে কিছু বোঝা গেল না, সাদেক স্থিরতর হলেন, আরো নিমগ্ন–লক্ষ্য রইলো তেমনি অবিচল।

রোকসানা এসেছে তার জীবনে অনেক পরে, দীর্ঘ চার বৎসর একক জীবন যাপনের পরে। রোকসানা ইউনির্ভাসিটিতে পড়েছে। রোকসানা যে ধরনের মহিলা সেকালে তাকে বলা হতো স্বাধীন জেনানা। জরিনার মা পড়তে পারতেন কাগজের মোটা হেডিংগুলো আর লিখতেন একটা বানান তিনবার ভেবে। জরিশার মা সাদেকের সমুখেও ভালো করে ঘোমটা না টেনে স্বস্তি পেতেন না। একটা তুলনামূলক বিচারে এলে, শাহ সাদেক আলী অনেকদিন ভেবেছেন, জরিনার মা তার অন্তর্লীন একটি সত্ত্বা, আর রোকসানা তার শুধু স্ত্রী, দ্বিতীয় স্ত্রী। তাই রোকসানা যে মানুষকে পাবে বলে আশা করেছিল, সে মানুষকে কোনদিনই পায়নি। কিন্তু এ অভিযোগও সে কোনোদিন করতে পারবে না যে সাদেক তাকে ভালোবাসেননি। মনে আছে বিয়ের পরদিন রোকসানা স্বামীকে তুমি সম্বোধনে কথা বলেছিল। সাদেক তখনি কিছু বলেননি। বলেছেন খাবার টেবিলে। তুমি আমার স্ত্রী, তোমার আমার দূরত্ব থাকবে না। শুধু একটা তুমি দিয়ে যদি কাছাকাছি হতে পারি তাহলে মনে হয় বিশ্ব সংসারে অনেক সমস্যাই এরপরে আর থাকছে না।

এ কী কথা বলার ধরন! কোনো উত্তাপ নেই, নেই রুক্ষতাও বরং যে হাসি তার ঠোঁটে তখন ফুটে উঠেছিল তার চেয়ে স্নিগ্ধ কিছু সারা জীবনে রোকসানা জানে নি। অথচ গোঁড়ামির অপবাদও কেউ তাঁকে কোনদিন দিতে পারবে না। মেয়েরা তাকে তুমি বলে। বড়ো মেয়েকে বেশি দূর পড়াতে পারেননি। জরিনার বেলায় সেটা দ্বিগুণ হচ্ছে। জরিনাকে সাদেক পড়িয়েছেন ইংরেজি মাধ্যমে ইংরেজি স্কুলে। শাহ সাদেক আলীকে বার থেকে দেখে এটা অনুমান করা শক্ত। রোকসানারও একেক সময় অবাক লাগে মানুষটার এই দ্বৈত চেহারা দেখে। বিশেষ করে যখন তার মনে পড়ে, সাদেক নিজে অনেক সংস্কার মনে প্রাণে মেনেও, সন্তানের জন্য, পরিবারের জন্য, সে সংস্কারকে জরুরি করে তোলেননি। আসলে যা রোকসানাও বুঝতে পারেনি, প্রগতিকে অন্য অর্থে নিয়েছেন তিনি। নিজে ভেঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারেন না। তাই বলে ভাঙ্গতে যারা পারবে তাদের তিনি বাধা দেবেন কেন?

আর এ থেকেই স্পষ্ট হয়, কী করে তিনি সবাইকে, প্রকট না করেও, নিজের আয়ত্ত্বে রেখেছেন আজীবন। তিনি যে কর্তৃত্ব করেন তা নয়, কিন্তু তাঁর কর্তৃত্ব না হলে চলে না। তার ইচ্ছেই শেষ ইচ্ছে, এ কথা তিনি কোনদিনই বলেননি, কিন্তু তাঁর ইচ্ছেই শেষ অবধি চিরকাল টিকে এসেছে অনায়াসে।

তাই কখনো কখনো তাকে পাহাড়ের মত অনড় আর ভারী মনে হয়েছে রোকসানার। মনে হয়েছে, দূর থেকেই ভালো, কাছে গেলে শিউরে উঠতে হবে তার বন্ধুরতা দেখে। অথচ আলীজাহ্, সাদেকেরই আপন ছোটভাই, সে কতো আপন মনে হয় তার। মনে হয়, এই একটা মানুষ যাকে শাসন করা যার, যে উদ্ধত ঋজু, কিন্তু নমনীয়। ভাইয়ে ভাইয়ে

এত তফাৎ খোদা কেন যে করেছেন তা বুঝতে পারে না রোকসানা। আলীজাহ্‌কে রোকসানা দেখেছে কম। কেননা সে এ পরিবারে আসার আগে থেকেই আলীজাহ্ তার পেশার তাগিদে প্রায় ঘর ছাড়া।

আলীজাহ্ সাদেকের চেয়ে অন্তত কুড়ি বছর কী তারো বেশি ছোট হবে। পেশাটাও সাদেকের চেয়ে অনেক দূর পারের, একেবারেই ভিন জাতের, গোটা পরিবারের ধারা থেকে আলাদা। আলীজাহ্ চিত্রনাট্য লেখে। তার স্বপ্ন, একদিন সে চিত্রপরিচালক হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আজো সে একটা বড়ো রকমের সুযোগ পেল না। অন্য কেউ হলে যেখানে হাল ছেড়ে দিতো, সেখান থেকেই আলীজাহ্ যেন হালের মুঠি আরো শক্ত করে ধরেছে। আলীজাহ্ সময় পেলেই লাহোর থেকে আসে, আর আসে টাকার প্রয়োজনে সাদেকের কাছে। আর যে কদিনই সে থাকে বেশির ভাগ কাটে তার জরিনার সঙ্গে। রোকসানা এ পরিবারে আলীজাকেই সবচেয়ে দেখেছে কম। অথচ স্বামীর বিরুদ্ধে কোনো একটা অভিযোগ গড়ে উঠলেই একটা মন কখন যেন নিজের অজান্তেই আলীজাহ্ সঙ্গে তার তুলনা করতে বসে যায়।

.

শাহ্ সাদেক আলী স্টাডিতে আরাম চেয়ারে বসে হাতলে প্যাড রেখে দ্রুত লিখে চলেছেন তার বিবৃতি। হঠাৎ চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন রোকসানা ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। সাদেক চোখ নাবিয়ে আনলেন প্যাডের ওপর। দুটো শব্দ লিখলেন। তারপর কলম মুড়ে, কী ভেবে বললেন, দোরপর্দার রং ইচ্ছে করলেই বদলানো যায়।

কিন্তু বাড়ি একবার তৈরি হলে বদলানো অসম্ভব। বাড়িটা কিন্তু তোমার কথামতই হয়েছে।

রোকসানা হাসলো। বলল, তা হয়েছে। এখন মানে মানে ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে দিতে পারলেই বাঁচি।

রোকসানার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল নিজের একটা বাড়ি হবে। আজ সে ইচ্ছে তার পূর্ণ হতে চলেছে।

সাদেক তার হাসিমাখা মুখের দিকে সঁচালো–কৌতুক চোখ করে বললেন, তা তুমি বাঁচো বৈকি! আমিও জিরোন পাই। রোজ রোজ তোমার অনুযোগ আর আমাকে শুনতে হবে না। শেষ কথাটি সাদেকের অত্যুক্তি। অত্যুক্তি এই কারণে যে রোকসানা কোনদিন অনুযোগ করেনি তার কাছে। অভিযোগ হয়ত ছিল, জানিয়েছে, কিন্তু অনুযোগ বলতে যা বোঝায় তা কখনোই নয়। এই যেমন, বাদলার দিনে বাথরুমে যেতে গিয়ে খানিকটা বৃষ্টিতে ভিজলেন সাদেক, কেননা শোবার ঘর থেকে বাথরুমে যেতে হলে উঠোন পেরুতে হয়, ফিরে যখন এলেন, তখন হয়ত বলেছিলেন, তোয়ালে দাও তো মাথাটা মুছে ফেলি। সেই তখন রোকসানা বললেও বলে থাকতে পারে–হতো নিজের বাড়ি, শোবার ঘরের সঙ্গেই থাকতো বাথরুম। ভাড়া দেবে বলেই কি লোকে এত বিচ্ছিরি করে বাড়ি তোলে! কিংবা খিড়কি দরোজা দিয়ে বেরুতে গেলে বারান্দা দিয়ে নেমেই পড়ে ডালিম গাছের নিচু ডালটা। সাবধানে না নামলে মাথায় লাগতে পারে। হয়ত জরিনার

একদিন লাগলো। সেই নিয়েও কথাটা উঠিয়ে থাকতে পারে রোকসানা। কিন্তু অনুযোগ, কখনো নয়।

বরং যা করতে সে ঠিক সাহস পায়নি সেই কথাটাই যখন স্বামীর মুখ থেকে শুনল তখন মনে মনে গর্বিত হয়ে উঠল রোকসানা। একটা বড় দায়িত্ব কৃতিত্বের সংগে পালন করার তৃপ্তিতে তার মন মুখর হয়ে উঠলো।

আরেকটা চেয়ারে, যেটা এতক্ষণ খালি ছিল এবং যেখানে একটা মাছি কয়েকবার বসবার চেষ্টা করছিল, রোকসানা বসলো। বলল, লেখা বন্ধ করতে কে বলল আপনাকে?

কই? শেষ হয়ে গেছে। বিকেলে চা খেয়ে একবার পড়ে নেবো, ব্যাস।

রোকসানা বলল, আবার কীসের প্রতিবাদ?

প্রতিবাদ নয়–প্রশ্রয়ের কৌতুক সাদেকের চোখে–বিবৃতি বলতে তোমরা শুধু প্রতিবাদই বোঝ। আর তাছাড়া মতায় থাকলে না হয় প্রতিবাদের প্রশ্ন উঠতো। ক্ষমতা নেই, গদি নেই, আমার আবার প্রতিবাদ কীসের? আমরা সবাই আবার গদি না থাকলে কথার কানাকড়ি দাম দিই না কিনা।

কিন্তু পরিহাসটুকু ধরতে পারল না রোকসানা। বুঝতে পারার মতো ক্ষমতা নেই একথা বললে ভুল হবে। আসলে আগ্রহ নেই।

একেক সময়ে সাদেকের মনে হয়েছে, যেহেতু জরিনার মা তার কর্মজীবনের জন্য অমন অবশ্যম্ভাবী ছিলেন তাই হয়ত রোকসানা বিপরীত বিন্দুতে তার নিজের স্থান বেছে নিয়েছে। আর এ ধারণার জন্যই খুব কম, প্রায় একেবারেই না, তিনি রোকসানার সঙ্গে তার কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা করতেন।

রোকসানার নিস্পৃহতা চোখ এড়ালো না সাদেকের। আরো স্পষ্ট হলো রোকসানা যখন ভিন্ন প্রসঙ্গ পাড়লো।

ইস, যা বিষ্টি নেবেছিল। ভাবলাম রাত অবধি চলবে বুঝি। শীতের মুখে কিন্তু হঠাৎ অমন একদিন পাগলা বিষ্টি নাবে।

হ্যাঁ, আমারো তাই ভাবনা হচ্ছিল। ভালো কথা, আলীজাহ্ সন্ধ্যের প্লেনে আসছে।

কই, শুনিনি তো। তাই নাকি?

চেয়ারে নড়েচড়ে বসলো রোকসানা।

এই তো খানিক আগে তার এলো। বলতে মনে নেই।

তা বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ যে?

হঠাৎ আবার কোথায়? ও তো ওমনিই। টাকার দরকার পড়েছে হয়ত।

তা–ই হবে। হাসলেন শাহ সাদেক আলী। ওর তো ধারণা আমার বিরাট টাকা, হাত পাতলেই হলো। তা যদ্দিন থাকে নিক না।

শেষের কথাটা ইচ্ছে করেই বললেন সাদেক। কেননা তিনি জানেন, আলীজাহ্ যে লাহোর থেকে এসে এমনি করে হাত পাতে তা রোকসানার পছন্দ নয়। কোনদিন রোকসানার মুখোমুখি আলীজাহ্ টাকা নেয়নি, সাদেক দেননি–তবু রোকসানা জানে। আর জানে বলেই তিনি তা লুকোন নি কোনদিন।

আর লুকোবেনই বা কেন? আলীজাহ্কে তিনি ভালোবাসেন শুধু সহোদরের মতো নয়, সন্তানের মতোও। দুজনের বয়সের দূরত্ব কুড়ি বছরের মতো হলেও মনের দিক থেকে বুঝি আলীজাহ্ সাদেকের সবচেয়ে কাছাকাছি।

মনে আছে কলকাতার কথা। সাদেক তখন প্র্যাকটিস করছেন, রাজনীতি করছেন আর আলীজাহ্ কলেজে নতুন উঠেছে। সাদেক চেয়েছিলেন আলীজাহ্ ডাক্তার হবে। কিন্তু ছোটবেলা থেকে যার আবদার তিনি শুনে এসেছেন উদার জনকের মতো, এ ক্ষেত্রেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

আলীজাহ্ বললেন, আর্টস পড়ব লেখক হবো। সাদেক বললেন, বেশ তো। লেখকরাও মানুষের ডাক্তার বৈকি। আমার ইচ্ছাটা কিন্তু একদিক থেকে অপূর্ণ রইলো না।

শেষ অবধি পড়াটাও ঠিক মতো হয়নি আলীজাহ্। তবু সাদেক কিছু বলেননি। বি.এ. পরীক্ষার রাতে দরোজায় খিল তুলে আলীজাহ্ হ্যাঁমলেটের পাঠ রিহার্সেল করছিল– পরদিন বেতারে অভিনয় করতে হবে। আড়াল থেকে চুপ করে দেখে নিঃশব্দে সরে এসেছেন সাদেক। কেবল বুঝতে পারেননি, লেখক হবার আকাক্ষা যার সে কেন অভিনয় নিয়ে এমন করে, এমনকি এই পরীক্ষার রাতেও মাথা ঘামাবে? বরং তিনি ক্ষুণ্ণই হয়েছিলেন মনে মনে। শাহ সাদেক আলী একটি মাত্র জীবনকালে একটি লক্ষ্যেরই সমর্থক, সে লক্ষ্যে যা কিছুই হোক না কেন। কই, সুযোগ তো এসেছিল অনেক, কিন্তু তিনি দশের উন্নতি আর নিজের উন্নতি একসঙ্গে কখনোই প্রার্থনা করেননি।

আলীজাহ্ বি.এ পরীক্ষা দেয়া হলো না, অভিনেতা হতে পারল না, লেখক হতে পারল না। হতে পারল না নয়; কী যে হলো তার, কিছুইতে মনের স্থিরতা এলো না অনেকদিন; কোথা থেকে অকারণে যে একটা বাতাস এলো– বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো ভাবনা, আচ্ছন্ন হয়ে রইলো। আকাক্ষা। এমনি করে তিন বছর। এমন কি বাসাতেও আলীজাহ্ নিয়মিত ফিরত না খেতে ঘুমোত না। তবু সাদেক কিছু বলেননি; আলীজাহ্ প্রতিভায় তার অগাধ বিশ্বাসকে কোনদিন এতটুকু ক্ষুণ্ণ হতে দেননি।

অবশেষে একদিন নিতান্তই আকস্মিকভাবে আলীজাহ্ তার লক্ষ্য বেছে নিল চলচ্চিত্র। বলতে গেলে গোটা পরিবারে এ এমন একটা বিদ্রোহী সংকল্প যা প্রথমে সাদেককেও

চিন্তাকুল করে তুলেছিল। কিন্তু মুখে তিনি কখনোই তা জানতে দেননি। বরং বম্বেতে প্রথম কাজ যখন সে পেল তখন সাদেকই খুশি হয়েছিলেন সকলের চেয়ে বেশি। আর সেই চরম খুশির প্রকাশটা ছিল, আলীজাহ্ যখন বম্বে থেকে গ্রেট পেনিনসুলারে এসে সকালে নাবলো হাওড়ায়, সাদেক নিজে তাকে গাড়ি করে আনতে গিয়েছিলেন।

তবু প্রতিষ্ঠা এলো না আলীজাহ্। দেশ বিভাগের পর গেল লাহোরে। সেখানেও না। অর্থের জন্য বেনামে চিত্রনাট্য লিখতে পারে আলীজাহ্ কেননা অর্থের অনেক দোষের মধ্যে একটা বড় গুণ, ওটা বেঁচে থাকার জন্য জরুরি। শস্তা ছবির শিরোনামায় আলীজাহ্ নিজ নাম কী করে যুক্ত হতে দেবে? শিল্পমাধ্যম যদি শিল্পকেই অস্বীকার করলো, তাহলে এখানে আলীজাহ্ কেন? তাই আজ অবধি রচয়িতা–পরিচালক হবার, ভালো ছবি করার ইচ্ছে তার রয়ে গেছে অপূর্ণ।

আর কেউ বুঝুক আর না বুঝুক, এটা সব চেয়ে ভালো করে বোঝেন শাহ সাদেক আলী। তাই তার স্নেহের উৎস আলীজাহ্ জন্যে আজো নির্মল, স্রোতস্বিনী।

পক্ষান্তরে এটা রোকসানার একটা গোপন মর্মপীড়া। কিন্তু কোন কালেই সাহস করে উচ্চকণ্ঠে কিছু বলা হয়নি। এবং আর দশটা কারণের মধ্যে এটাও একটা কারণ যে, তাতে সাদেক আহত হবেন।

সাদেক বললেন, চা দেবে না?

রোকসানা মুখে বলল, দিচ্ছি।

কিন্তু মনটা পড়ে রইলো আলীজাহ্ দিকে। আলীজাহ্ আসছে। এবারো সেই পুরনো ব্যর্থতার গল্প অমিত উপহাস মেশানো কণ্ঠে–দুদিন কী তিনদিন। তারপর সে চলে যাবে। না, এবার আলীজাহ্কে এত তাড়াতাড়ি যেতে দেবে না রোকসানা। নতুন বাড়ি হয়েছে। তাকে দেখাতে নিয়ে যাবে রোকসানা। অনেক পরামর্শ আছে সাজানো গোছানোর ব্যাপারে। জরিনার সঙ্গে হয়ত এ নিয়ে কথা বলা যেত, কিন্তু যখনি বলতে গেছে, প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে তার, জরিনা হেসে উঠবে–যে হাসি গিয়ে বিধবে তার মর্মমূলে। মনে হয়েছে, জরিনা সংসারের এইসব খুঁটিনাটিকে উপহাস করে নিজ সত্তাকে নিশানের মত উঁচু আর ভাবনাহীন করে রাখতে পারে। না, জরিন থাক তার নিজেকে নিয়ে; আলীজাহ্কে তার এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আসছে, ভালোই হলো।

আর হঠাৎ মনে পড়ল রোকসানার–আলীজাহ্ কি খুশিটাই না হবে যখন সে দেখবে তার নিজের কামরা। দোতলার উত্তর–পূর্ব দিকের কামরাটা নির্দিষ্ট হয়েছে আলীজাহ্ জন্যে। যদিও নকশায় কামরাটা দাগ দিয়ে রেখেছে জরিনা, তবু সাজিয়ে তোলা তো তারই হাতে। আলীজাহ্কে এবার রোকসানা সত্যি সত্যি অবাক করে দেবে। বলবে, তুমি তো বাইরে বাইরে থাক, বউ নিয়ে এসো, সে এখানে থাকবে, তুমি তোমার মতো সিনেমা করোগে হিলি দিল্লি।

মনটা আস্তে আস্তে প্রীত হয়ে এলো রোকসানার। কেউ জানলো না এ কথা, এত একান্তে। শুধু চেয়ারের বাজুতে চোখ–বোজা বেড়ালের বাচ্চার মত বা হাত তার শীতল হয়ে পড়ে রইলো।

হঠাৎ হাতটা ছিটকে পড়লো কোলের ওপর। জরিনার কামরা থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠা সংগীতের আচমকা ধাক্কায় রোকসানার স্নায়ুগুলো যেন আর্তনাদ করে উঠলো।

জরিনা তার রেডিওগ্রামে আবার সেই রেকর্ড চাপিয়েছে যার শুরুতে ট্রাম্পেটের বিকট কয়েকটা খোঁচা। বেশ তো ছিল এতক্ষণ মেয়েটা ঘুমিয়ে। হঠাৎ এই বিশ্রী আওয়াজটাকে জীবন্ত করে তুলতে বলল কে তাকে? আর কী চড়া ভল্ম, যেন সব কিছু ডুবিয়ে ছাপিয়ে দিতে চায়, যেন বাড়িতে একটা ছোটখাটো রেডিওর দোকান খোলা হয়েছে।

সুর আসছে। চপল, বহুমুখী, তীব্র, ধাতব।

রোকসানা উঠে দাঁড়াল। এত জোরে না বাজালেই কি নয়?

হয়ত কানে হাত দিত রোকসানা, কিন্তু দিল না। সাদেক বললেন, কিছুটা নিরুত্তাপ কণ্ঠে, বোসো তুমি। না, বসবে কেন? আমাদের চা দিতে বলো। জরিনাও খাবে। আমি ওকে দেখছি।

.

আস্তে আস্তে জরিনা মাথা রাখলো বালিশে। দুহাত চুলের পেছনে রেখে, দুপা সমুখে ছড়িয়ে, সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। শাড়ি উঠে এসেছে শুভ্ররক্তিম, চিতা বাঘের বুকের মত জানু অবধি। বৃষ্টি নেমেছিল দুপুরে। একটু ঠাণ্ডা করছে বৃষ্টি–শেষের বাতাসে। তা করুক।

আলীচাচা বলেন, হৃদয়কে যা স্পর্শ করে একমাত্র তা–ই সত্য।

একটু আগেই কবিতা লিখতে চেষ্টা করেছিল জরিনা। একটি সুন্দর সনেট। কিন্তু হলো না। বদলে আলীচাচার মুখ ভেন্টিলেটর থেকে উপুড় হয়ে পড়া আলোর মতো তার দুচোখ জুড়ে রইলো। তার সমস্ত কবিতা যেন তার অজান্তেই একটি মাত্র পাঠকের জন্য গড়ে ওঠে; অক্ষর হয়, হয়ে এসেছে, এই এতকাল, তার পনেরো বছর বয়স থেকে, যেদিন থেকে সে কবিতা লিখতে শুরু করে–আলী চাচার জন্যে।

ঠিক এমনি মুহূর্তগুলোয় আর কাউকে তার মনে পড়ে না।

আর মাকে তার মনে পড়ে, যে–মার কথা মনে করলে কথা কয়ে ওঠেন, যে মার মুখ শুধু কাঠ পুতুলের মতো নয়, যে মা মাথার নীল রিবন বেঁধে দেন মনে করলেই সেই মাকে মনে পড়ে।

আলীচাচার নাম কবে যে পর্দায় দেখতে পাবে জরিনা! শহরের সবচেয়ে অভিজাত শো হাউস; ঠিক দুপুর রোদে কিশোরী মুখের মত সবুজ তেতে ওঠা, লম্বা কাঁচের প্যানেল আর মানুষের পোশাকের ভিড়–একটা ছবির মতো তার চোখের সমুখে ভেসে ওঠে। ভেতরে আলো নিবলো মিষ্টি ঘণ্টা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে। আর অন্ধকার। আর সুবাস। চোখ সয়ে এলে পর মানুষ। ততক্ষণে পর্দায় ভেসে উঠেছে রচনা ও পরিচালনা–আলীজাহ্। তারপর নিবে যাওয়ার আগে, আসন্ন ছবির শুরুতে, আগুনের মতো একবার জ্বলে উঠে–সেই নাম মিলিয়ে গেল।

আলীচাচা বলেছিলেন, আমার ছবির শুরুতে, একেবারে প্রথমে, বইয়ের নামেরও আগে কবিতার একটা লাইন ভেসে উঠবে পর্দায়। কার কবিতা জানিস?

কার?

তোর।

আমার? আমার!

বিস্ময়ে প্রায় আর্তনাদের মত শুনিয়েছিল জরিনার কণ্ঠস্বর।

হ্যাঁ, তোর মানে, সেবার আমাকে কতগুলো কবিতা দিয়েছিলি ইংরেজিতে লেখা, হারে, ইংরেজিতে লিখিস কেন? বাংলায় লিখতে পারিস না? বাংলায় লিখবি।

জরিনা যেন নিবে যায়। বলে, তাই তো লিখি। শুধু কখনও ইংরেজিতে। তোমরা মনে কর আমি বুঝি বাংলায় লিখতে জানি না।

তা কেন? তোর সেই ছোটবেলায় লেখা বিচ্ছিরি রকমের অদ্ভুত চিঠিগুলোর কথা আমার মনে আছে। আমার চেয়েও ভালো বাংলা লিখিস তুই সেই তখন থেকেই।

জরিনা একটু বিব্রত হয় যেন চিঠির প্রসঙ্গে। চটপট মুখ সুঁচালো করে বলে, আমার কোন কবিতা নিয়েছ তাই বলো।

আলীজাহ্ তার সুগন্ধ সিগারেটে টান দেয়।

তোর সেই কবিতা–A Torso I am এর প্রথম দুটো লাইন।

আমার মনে নেই।

আমার আছে।

আলীচাচা তখন তর্জনী তুলে শূন্যে একটা সরল রেখা এ মাথা থেকে ও মাথা অবধি টানতে টানতে বলেছিলেন,

ফেড ইন করছে–দ্যাখ–

Beneath the black sun
We shall rise in a flame

তার কণ্ঠ এত গভীর আর আবৃত্তি এত সুন্দর যে জরিনার মনে হয়েছিল এ দুটো লাইন সে কোনকালে লেখেনি। যেন পৃথিবীর অন্তস্থল থেকে এক যথার্থ কবি কোন এক মঙ্গলমুহূর্তে উচ্চারণ করেছিল এই দুটো লাইন, আব তা জীবনকাল, জীবনকে অতিক্রম করে অনন্তকালের মত শুদ্ধ এবং সত্য হয়ে আছে আলীজাহ্ উজ্জ্বল আত্মায়।

আলীজাহ্ আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে জরিনার চোখে তৈলচিত্রের মতো একটা ছবির জন্ম নিয়েছিল সেদিন। বিশাল কোবাল্ট নীলের দিগন্তজোড়া ক্যানভাসে কার এক অদৃশ্য আঙ্গুল যেন দীর্ঘ অথচ সরু সোনালি তরঙ্গ এঁকে গেল। তখন তার বয়স ষোল...Beneath The Black Sun.. কী সে ভেবেছিল সেই ষোল বছর বয়সে : এখন, এই মুহূর্তেও সেই ভাবনা তার ভাল লাগলো একটা ব্যথার মত... We Shall Rise... সে আর আলীচাচা...সোনালি তরঙ্গ...In A Flame... যদি তা সত্যি হতো।

আলীচাচা একদিন ছবি করবেনই।

.

কিন্তু আজ এই বৃষ্টি থামবার পর কোন কবিতা লিখতে চেয়েছিল জরিনা? কী ভাবছিল সে? না, না, না। নাম—অমর নাম পৃথিবীতে একটিও নেই– যে নাম জন্ম নিয়েছে জ্বলন্ত, দীর্ঘ, রক্তিম, আদিম অগ্নিশিখা থেকে। নেই, নেই, নেই। পনেরো বছর বয়সে পুরো হাক্সলি। জরিনা জানে, খুব ভালো করেই জানে, পনেরো বছর বয়সে সে পড়েছে অডাস হাক্সলি রূপকথার সমান আগ্রহ নিয়ে পড়ে শেষ করেছে এমন মেয়ে গোটা দেশে আর একটিও জন্মায়নি। আর এখন তার বিষ–ফল ভুগতে হচ্ছে। কিন্তু হাক্সলি তাকে পড়তে বলেছিল কে?

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। নূরু আপার বাসায় একদিন সে একটা ইংরেজি পত্রিকা দেখেছিল। নূরু আপার স্বামী হামিদুর রহমান ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। সেই পত্রিকায় জরিনা দেখেছিল হাক্সলির ছবি। থ্রি কোয়ার্টার প্রোফাইল। চশমার একটা তেকোণা ছায়া, প্রায় দাঁড়া ছড়ানো মাকড়শার মতো, পড়েছে চোয়ালের হাড়ে। অদ্ভুত মনে হয়েছিল মানুষটাকে জরিনার। মনে হয়েছিল, কেন মনে হয়েছিল এই হাস্যকর কথাটি তা সে জানে না, লোকটা কী খেয়ে বেঁচে থাকে? কোন দর্জির দোকান থেকে কাপড় কাটিয়ে থাকে এই লেখক? আর তার বিছানার চাঁদরের রঙ?

জরিনা জানে, জরিনা অনেকদিন দেখছে, মাঝে মাঝে যাদের নিয়ে এইসব কথা মনে হয়, যা অন্তরঙ্গ, অথচ মুখে বললে শোনাবে হাস্যকর, সেই মানুষগুলো তার জীবনে কোনো না কোনো নতুন মানে যোগ করে দিয়েছে।

সেদিনই জরিনা হামিদ দুলাভাইয়ের কাছ থেকে প্রথম নিয়ে এসেছিল হাক্সলির বই। বেতের গোল চেয়ারে দুপা বুকের কাছে ছড়িয়ে তুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে মেতে থেকেছে এই নতুন লেখকের বই নিয়ে, যার চোয়ালের হাড়ে একটা ছবিতে ছায়া ফেলেছিল দাঁড়া ছড়ানো মাকড়শা।

সেই হাক্সলি, ঠিক মনে পড়ছে না, কোথায় যেন বলেছিলেন, আজো মনে পড়ে জরিনার আমাদের এই পৃথিবী অন্য কোনো গ্রহের নরক।

কথাটা ভালো লেগেছিল তার। যেমন করে তার ভালো লাগে আলীজাহ্ কথা। মনে হয়েছিল তার নিজেরই ভাবনায় এতকাল এই কথাটা জন্ম নিয়ে প্রচ্ছন্ন থেকে প্রতীক্ষা করছিল মুক্তির জন্যে। এত সহজ, এত গভীর, এত চেনা। এই পৃথিবী, এই সবুজ পৃথিবী, এই আলোয় জ্বলা আঁধারে ডোবা পৃথিবী অন্য কোনো গ্রহের নরক। তাহলে স্বর্গ কোন গ্রহ? সেখানে কি লেখক নেই একজনও?–হাক্সলির মতো?–যে এমনি চেনা গলায় বলতে পারে এই গ্রহ অন্য কোনো গ্রহের স্বর্গ?

তারপর অনেকদিন পরে, যখন তার অনেকদিন হলো পড়া হয়ে গেছে হাক্সলি, হাক্সলির ওপরে হঠাৎ বিতৃষ্ণা জন্মে জরিনার।

আলীচাচা বলেছেন—সবার চেয়ে বড় কথা, হৃদয়কে যা স্পর্শ করে একমাত্র তা–ই সত্য।

২. জরিনার মা মারা গিয়েছিলেন

জরিনার মা মারা গিয়েছিলেন সন্তান হতে গিয়ে, প্রায় তিনদিন যমে-মানুষে টানাটানির পর। মা আর সন্তান বাচলো না কেউই। শাহ সাদেক আলী তখন উত্তর বাংলা সফরে বেরিয়েছেন।

আলীজাহ্ তার করল তিন জায়গায়। সেই তার সাদেকের হাতে গিয়ে যখন পৌঁছুলো আর যখন তিনি ফিরে এলেন, তখন দাফন হয়ে গেছে। সাদেক নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন তার স্টাডির চামড়া–মোড়া গভীর চেয়ারে।

সাদেক কাছে ডাকলেন না কাউকে। না নূরুন্নাহার, না জরিনা। আলীজাহ্ তাদের আগলে রইলো। সারা বাড়ি ভরে উঠলো পাষাণ–চাপা নিস্তব্ধতায়। একটা মানুষ যে সহস্র হয়ে আলো করে থাকতে পারে, তা কে জানতো? কোনদিন সরাসরি সম্পর্ক ছিল না সংসারের সঙ্গে সাদেকের। এখন সেটুকুও আর রইলো না। হঠাৎ যেন এক সাগর–সংগ্রামে এসে দাঁড়িয়েছেন শাহ সাদেক আলী। যেন তার এই স্তব্ধতার, অনুপস্থিতির, স্বল্পভাষীতার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই আর; আর, উত্থান নেই, পতন নেই; কেবলি প্রবাহিত হচ্ছে একটি স্থির অকল্প দীর্ঘ সরলরেখা।

বিপরীতে পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো দুবোন, জরিনা আর নুরুন্নাহার। পিঠেপিঠি দুবোন নয় তারা, তখন তারা সাত আর তেরো। নূরুন্নাহার ছিল চপল দুষ্টু। তার কপাল ছিল আধখানা চাঁদের মত ছোট আর চাপা, নাক তিলের মতো এই এতটুকু। আর প্রশস্ত দুই

পাতলা ঠোঁটে রেশমি রক্তিমতা। দুষ্টুমিটা ছিল ওর নেশা। চতুরালি ছিল ওর স্বভাব। উল্টো দিকে জরিনা তার অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত কপাল, চাঁদের মত গোল মুখ আর ক্রীম রঙা রেকাবির মতো গাল–যা ক্ষণে ক্ষণে হয়ে উঠতো লাল–আর ব্রাউন রঙ চুল নিয়ে নুরুন্নাহারের পাশে ছিল অনেকটা বোকা, মন্থর, হয়ত কিছুটা সাবধানী। চট করে দেখলে বাইরের কেউ মনে করেও বসতে পারত যে, মেয়েটা বোবা–এমনি তার চাহনি, এমনি তার চলন।

নূরুন্নাহারের সমস্ত দুষ্টুমি গিয়ে পড়ত জরিনাকে নিয়ে। জরিনার কান্না পেত। কিন্তু তবু নূরুন্নাহারের সঙ্গ থেকে এতটুকু দূরে সরে যেত না সে।

বৃষ্টি পানিতে সমুখের পথটা নদী হয়েছে তো নূরুন্নাহারকে নৌকা বানাতে হবে। আর তার কাগজ জোগাবে জরিনা নিজের খাতা ছিঁড়ে–এতে তার আনন্দ। অথচ একটা নৌকাও যদি কোনদিন সে ছুঁতে দিয়েছে জরিনাকে। আর সন্ধ্যে বেলায় খাতার এ হেন অবস্থার জন্যে মাস্টারের বকুনিটুকুও খেতে হলো জরিনাকে। নূরুন্নাহার তখন মুখ টিপে হাসছে। এমন কি মাস্টার নূরুন্নাহারের লক্ষ্মীপনার আদ তুলে ধরে জরিনাকে তখন বলছে–এইতো তোমারই বোন, তার খাতা দেখ দিকি–কেমন ঝকঝক করছে।

কিংবা নূরুন্নাহারের বুদ্ধিতেই একটা নতুন খে, আবিষ্কার হলো, পাল্লা দিয়ে সিঁড়ি থেকে কে কত তাড়াতাড়ি নেবে আসতে পারে। তখন দুপুর বেলা। চারদিক সুম সুম করছে। দৌড়ে নাবতে গিয়ে ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ল জরিনা। কপালের কাছে তেরছা হয়ে আধ ইঞ্চিটাক কেটে গিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল দর দর করে। চিৎকারে করে উঠলো।

যে মেয়েটি স্বভাবতই কিছু বলে না তার এই আকস্মিক চিৎকারে ঝন ঝন করে উঠলো গোটা বাড়ি। ওপর থেকে মা এলেন, এলেন সাদেক। ওদিকে নুরুন্নাহারই তখন উবু হয়ে পড়ে কামিজের খুট দিয়ে রক্ত মুছে দিচ্ছে জরিনার। জিজ্ঞেস কলে বলছে, আমি তো জানি না। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম. চকার শুনে এসে দেখি বাবুর এই অবস্থা। আমি কী করব বল? কোন প্রতিবাদ করল না জরিনা। আর আশ্চর্য, সেই রক্তঝরা যন্ত্রণার মধ্যেই সে মুগ্ধ হলো, ঈর্ষান্বিত হলো বোনের মিথ্যে বলার অপূর্ব সাবলীলতা দেখে। কপালের সেই কাটা দাগটা জরিনার এখনো আছে একটা আবছা খয়েরি দাগ হয়ে।

এই তো সব দুষ্টুমি। তবু জরিনা সঙ্গ ছাড়বে না নূরুন্নাহারের।

একেকটা হঠাৎ পাওয়া ছুটির দুপুরে কিংবা কোনদিন রাতে কেন যে নূরুন্নাহার একলা থাকতে চাইতো, তন্ময় হয়ে যেত নিজেকে নিয়ে, জরিনা তা বুঝে উঠতে পারত না। তখন কাছে গেলে তাড়া খেয়ে ফিরে আসতে হতো। কিংবা এমনও হয়েছে, নূরুন্নাহার ডুবে গেছে নিজের প্রসাধনে। আয়নার সামনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুল বাঁধা, রিবনে বো ভোলা, চলছে তো চলছেই। আর পাউডার পাফ আর ভ্রু আঁকা। তখন জরিনাকে সে তাড়িয়েও দিত না, কথাও বলতো না–তার উপস্থিতিকে একটা করুণার দৃষ্টি দিয়েও যেন স্বীকার করতে চাইতেন নূরুন্নাহার। আর জরিনার মনে হতো একটা নতুন মানুষ, একটা বাইরের মানুষকে সে দেখছে। অনেকক্ষণ–সে দাঁড়িয়ে থাকতো, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার চিবুক অবনত হয়ে আসত–প্রায় দুই ছুঁই হতো গলার ভাজটার কাছে। বু নূরুন্নাহার নির্বাক, নিস্পৃহ।

একদিন রাতের বেলায় খেয়ে দেয়ে জরিনা গিয়েছিল নূরুন্নাহারের কামরায়।

বছরখানেক হলো নূরুন্নাহার বড় শোবার ঘরের পাশে ছোট কামরাটায় থাকে আর জরিনা মায়ের কাছে। জরিনা গিয়ে দেখে বিছানায় উপুড় হয়ে সে খাতায় উল্টোদিক থেকে প্রথম পাতায় কী লিখছে। জরিনা কাছে যেতেই নূরুন্নাহার খপ করে কোমর বাঁকিয়ে আধো উঠল। কিছু বলার আগেই কৌতূহল ততক্ষণে জরিনার মুখে কথা এনে দিয়েছে।

কী লুকোলি, আপা?

সে কথার জবাব না দিয়ে নূরুন্নাহার সোজা তর্জনী দেখিয়ে দেয়।

পালা, পালা শীগগীর। বলে দেব মাকে? আমার পড়া ডিস্টার্ব করছে?

বলনা আপা।

না।

বালো।

বলছি–না।

জরিনা আর প্রশ্ন করে না। কিন্তু চলেও যায় না। তেমনি খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। কী ভেবে নূরুন্নাহার শরীরের ভঙ্গিটাকে বদলায়, মুখটাকে শিথিল আর মসৃণ করে আনে। উঠে বসে বলে, নাহ, তোর জ্বালায় কিছু করবার যো নেই। তুই ছেলে মানুষ–তুই কী বুঝবি? যখন ক্লাস এইট নাইনে পড়বি তখন।

জরিনা বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। মনে একটু দুঃখও হয় হঠাৎ এই বয়সের পার্থক্যটা আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দেয়ার জন্য। রাগ হয় দেমাক দেখে। কিন্তু রাগের চেয়েও বেশি হয় কৌতূহল আর ঈর্ষা।

নূরুন্নাহার বলে, দাঁড়া পেছন ফিরে। ছাড়বিনে যখন, দেখাচ্ছি। কাউকে বলতে পাবিনে কিন্তু। দাঁড়া শীগগীর–আর একটু ঘুরে। যখন ফিরতে বলব তখন তাকাবি–তার আগে না, খবরদার।

জরিনা পেছন ফিরে শব্দ শুনতে পায় নূরুন্নাহারের খাতা থেকে পাতাটা ছিঁড়ে ফেলল। তারপর ভাঁজ করার আওয়াজ। কিন্তু ফিরতে বলল না তাকে। নূরুন্নাহার সমুখে এলো তার। হাতে কাগজটা। বলল, একবার দেখতে পাবি–। এক সেকেণ্ড।

জরিনা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। নূরুন্নাহার ভাজ খুলে কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরেই টুক করে সরিয়ে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে জরিনার চোখে শুধু কতকগুলো

হিজিবিজি লেখা জীবন্ত হয়ে, তরঙ্গ হয়ে উঠেই মিলিয়ে যায়। একটা অক্ষরও সে বুঝতে পারে না।

বলে, কী।

কী আবার? দেখালাম তো।

তারপরই খপ করে জরিনাকে টেনে নিয়ে খাটের উপর বসিয়ে দেয়, কাগজটা আবার পুরোপুরি চোখের সমুখে মেলে ধরে, একেবার পেছন ফিরে দরোজার দিকে দেখে নেয়, ফিসফিস করে বলে, কিছু পড়তে শিখিস নি? এই দেখ–ভ–এ আকার ভা, ল–এ ওকার লো, ব–এ আকার বা, আর দন্ত্য স–এ আকার সা–ভালোবাসা।

জরিনা পড়তে পারে এবার। অবাক হয়ে দেখে সারাটা কাগজ জুড়ে শুধু ওই একটি শব্দই বারবার লেখা। কেন যেন দুপ দুপ করতে থাকে তার বুক, এত আস্তে এত কানের কাছে মুখ রেখে নূরুন্নাহার কথা বলছে।

জানিস, বাবা মাকে ভালোবাসে।

জরিনার খুব অবাক লাগে। মনে মনে ছবিটা ভেসে ওঠে, বাবা চেয়ার টেবিলে বসে লিখে চলেছেন। বাবা দিনরাত লেখেন। কিন্তু কই, সে গিয়ে পড়লে বাবা তো এমনি করে কাগজ লুকোন না। বাবা কি এমনি সব কাগজে লিখে মা–কে দেন? মাঝে মাঝে

মানুষজন আসে। এসে, সব লেখা কাগজপত্র নিয়ে যায়। বাবা তাহলে ওদেরও ভালোবাসেন।

নুরুন্নাহার হঠাৎ বলে, খবরদার, কাউকে বলবি না, মাকেও না।

না না না।

জরিনা শুধু মুখে বলে না, মাথা নেড়েও উত্তর করে।

চোখ ছুঁয়ে বল্ কাউকে বলবি না –যা পালা শীগগীর।

জরিনার গা কেমন শিরশির করতে থাকে–ঠিক দুপুর রাতে ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ অন্ধকার দেখলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি।

এমনি করে দিনের পর দিন।

কিন্তু একটা দরোজা পেরুলে পরের কামরা যেমন আগের কামরা নয়, ঠিক তেমনি মায়ের এন্তেকালের পর দুবোনের সম্পর্ক একটা নতুন চক্রে এসে বিকশিত হয়।

আরম্ভটা ছিল এ রকম–

বৃহস্পতিবার রাতে মারা গেলেন জরিনার মা। শনিবারের দুপুরের কথা। শাহ সাদেক আলী আলীজাহ্ তার পেয়ে সেইদিনই সকালে এসে পৌঁছেছেন। সেই তখন থেকে তিনি তার স্টাডিতে। অন্য দিনের মতই ইংরেজি বাংলা মিলিয়ে একগাদা দৈনিক কাগজের স্তূপ তার সমুখে। একের পর এক পড়ে যাচ্ছেন। কখনো পেন্সিল দিয়ে দাগ দিচ্ছেন কোনো খবরে। এতবড় বিয়োগের চিহ্ন বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। কেবল পাশের টিপয়ে যেখানে রুপোর বাটিতে এলাচদানা থাকত আজ সেই টিপয়টা শূন্য।

বাইরের ঘরে একজন হাফেজ বসে পড়ছে পাক–কোরআন। আর আলীজাহ্ এই এতক্ষণে সবে বাথরুমে গেছে গোসল করতে। বেলা প্রায় আড়াইটা।

জরিনাকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে ছিলেন তার মামানি। বিধবা মানুষ। সংসারে আপন বলতে আছে একমাত্র ছেলে বুলু। ম্যাট্রিক দিয়েছে এবারে। জরিনার মা মারা যাওয়ার খবর পেয়ে তাতিবাগান থেকে বুলুকে সঙ্গে করে এসেছেন কয়েকদিনের জন্য।

জরিনাকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে নিজেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি। হাত শিথিল হয়ে এসেছে জরিনার মাথার ওপর থেকে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল জরিনার। ধড়মড় করে উঠে বসে চারদিকে তাকিয়ে কেমন সব অচেনা মনে হলো। খুব নিচু গলায় একবার ডাকল–মা। রোদে আর দুপুরের বাতাস। কেউ সাড়া দিল না। তখন এক পা এক পা করে নিচে নেমে এলো জরিনা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কী ভাবল খানিক। চারদিকে কেউ নেই। শুধু বাথরুম থেকে শব্দ আসছে পানি

ছিটানোর। সেই শব্দটা উৎকর্ণ হয়ে খানিকক্ষণ শুনে জরিনা এবার একরোখার মতো সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। নেমে বারান্দা পেরিয়ে বসবার পর। হাফেজ একবার তাকিয়ে দেখলেন কী দেখলেন না। তাঁর ক্লান্ত, বিলাপী, করুণ আবৃত্তি পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো সে। হাঁটতে লাগল হনহন করে।

খপ্ করে কে হাত ধরতেই জরিনা তাকিয়ে দেখে, বুলুভাই। হাত মুচড়ে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘুম ঘুম গলায় বলে, ছাড়ো।

কোথায় যাচ্ছিস তুই?

মার কাছে।

চোখ তুলে বলেই নাবিয়ে নেয় জরিনা। পানিতে টাবুটুবু হয়ে আসে দুচোখ।

যেতে দাও আমাকে।

কিন্তু বুলু যখন তাকে কোলে তুলে নিল তখন এতটুকু বাধাও দিল না জরিনা। বাসায় ফিরে দেখে নূরুন্নাহার বারান্দায় তাকেই খোঁজাখুঁজি করছে। বুলু তার হাতে জরিনাকে তুলে দিয়ে বলে, কাণ্ড দেখেছ জরিনার? গোরস্তানে যাচ্ছিল, ভাগ্যিস আমি পথে দেখে ফেলেছিলাম।

নূরুন্নাহার তার কপালে হাত রেখে চিবুক ধরে শুধোয়, তাই নাকি?

কোনো কথা বলে না জরিনা। তখন তাকে নিয়ে ওপরে নিজের কামরায় উঠে আসে সে।

বলে, আয়, আমার পাশে ঘুমুবি।

বলে নিজেই তার ধূলো পা মুছিয়ে দেয়। নিজে শোয়। পরে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ পরে শুধোয়, মাকে দেখবি?

বালিশের নিচে থেকে নূরুন্নাহার মায়ের বাঁধানো ফটো বার করে। দুজনে তাকিয়ে দেখে। তারপর হঠাৎ ফটো একপাশে সরিয়ে রাখে, জরিনাকে জড়িয়ে ধরে নূরুন্নাহার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। জরিনারও কান্না পায়। ভীষণ কান্না। কিন্তু কাঁদে না। নিজের বুকে অনুভব করে নূরুন্নাহারের কান্না।

.

প্রায় ছমাস পরের কথা।

দোতলার শেষ মাথায় যে গোল বারান্দা তার লাল মেঝেয় বসে রেলিংয়ের ফাঁকে দুপা ঝুলিয়ে দিয়ে জরিনা খুব এক মনে কিছুই ভাবছিল না। তার পা অবধি প্রায় উঠে এসেছে কচি আমগাছটা। হাতের ডানে বড় নিমগাছে বাতাস কাঁপছে। চারদিকে আসন্ন

সন্ধ্যা। আকাশ হয়ে উঠেছে ভারী, ভিজে ভিজে, বেগুনি লাল আর হাতের শিরার মত এখানে ওখানে নীল–নীল। চড়ুইগুলো দিনমান কোথায় কোথায় উড়ে বেড়িয়ে ফিরে এসেছে তাদের আমগাছের ডালে। হুল্লোড় বাধাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। আর ওপাশের নিমগাছটায় ডানা ঝাঁপটাচ্ছে বাসা ফেরৎ কয়েকটা কাক। দূরে ট্রাফিকের শব্দ, ভারী কিন্তু আবছা–একটা মোটা পর্দার ভেতর দিয়ে ছুঁয়ে পড়ছে সিরাপের মতো। রাস্তায় জ্বলে উঠেছে বাতি। কিন্তু দিনের আলো তখনো অন্ধকার নয় বলে ম্লান, ছোট ছোট দেখাচ্ছে, রাত হলে আস্তে আস্তে ওরা বড় হবে।

জরিনা চুপ করে এইসব দেখছিল। খুব অস্পষ্ট করে নিজেকে যেন মনে হচ্ছিল অমনি ম্লান, অমনি ছোট ছোট, দূরে দূরে। অই বয়সি অন্য যে কোন মেয়ে এত দীর্ঘক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে পারত না। কিন্তু জরিনা পারে। বরং এইটেই তার ভালো লাগে।

আমগাছে এতক্ষণে চড়ুইগুলো শান্ত হয়ে বসেছে। আর কোনো শব্দ নেই। এই সন্ধ্যার ধূসর ছোটো একমুঠো শরীরগুলো ওড়াউড়িও করবে না আর। আকাশ থেকে নীল শিরাগুলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে এক্ষুণি।

শাহ সাদেক আলী মগরেবের নামাজ আদা করে বারান্দা দিয়ে আসছিলেন, হঠাৎ অন্ধকারে আবছায়া পেছনটুকু দেখতে পেলেন জরিনার। বিরক্ত হলেন এদিকে এখনো কেউ বাতিটা জ্বেলে দিয়ে যায়নি বলে। ভাবলেন আলোটা নিজেই জ্বালাবেন। কিন্তু জ্বালালেন না। জরিনাকে হঠাৎ এভাবে বসে থাকতে দেখে কৌতূহলে মনটা তাঁর ভিজে উঠলো। পা টিপে পেছনে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

নতুন করে মেয়েটাকে যেন চোখে পড়লো তার। নিজের সন্তানকে একেক সময় কত অপরিচিত মনে হয়, এ কি তিনি কখনো জানতেন? মনে হলো, পৃথিবীর দুপ্রান্তে দুটো দেশ–তারা দুজনে সেই দুদেশের অধিবাসী। আকাশে যেমন করে একটা কক্ষচ্যুত তারা অযুত অযুত বছরে একবার হঠাৎ জ্বালিয়ে দেয় বিপর্যয়ের আগুন, ঠিক তেমনি তিনি আজ ছিটকে এসে পড়েছেন দক্ষিণের এই অন্ধকার গোল বারান্দায়। কিছু বললেন না তিনি, শুধু স্তব্ধ হয়ে তার পেছনে দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ।

তারপর আস্তে আস্তে জরিনার পাশে, নিচু টুলের ওপর বসলেন শাহ সাদেক আলী। মেয়েটা একটু চমকে উঠেই একহাতে আঁকড়ে ধরলো তার জানু আর ঠিক তেমনি তাকিয়ে রইলো সমুখের দিকে। সাদেক বললেন, কী দেখছিস? পাখি?

হ্যাঁ।

কী নাম পাখির?

চড়ুই।–চড়ুই আমাদের ঘরে রোজ কুটো ফেলে যায় জানো আব্বা।

তাই নাকি?

দুজনে সমুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে। কে কারো দিকে তাকায় না। তাকাবার প্রয়োজন হয় না! বাবাকে ভালো লাগে জরিনার। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সে একটু। সাদেক তখন বলে চলেছেন, ঠিক আমাদের যেমন দুঃখ হয়, কষ্ট হয়, তেমনি পাখিদেরও।–ঝড় উঠলে ওরা থাকবে কোথায়? তাই আমাদের দালানে এসে খড়কুটো দিয়ে বাসা করে। তাড়িয়ে দিলে আল্লাহ দুঃখ পাবেন, বলবেন–আমার বান্দা একটা অসহায় জীবকে শুধু শুধু কষ্ট দিয়েছে। আল্লাহ আমাদের পাপ দেবেন।

জরিনার তখন এ কথায় কান নেই। তার মন তখন ঘুরছে অন্য প্রসঙ্গে। চট করে প্রশ্ন করে, আব্বা, পাখিদের নাম নেই?

নাম?–হ্যাঁ নাম আছে। আমরা ওদের কথা বুঝতে পারি না, তাই। সোলেমান নবী ছিলেন অনেকদিন আগে তিনি বুঝতে পারতেন ওদের কথা। দুনিয়ার সব জীব–জন্তুর সঙ্গে কথা বলতেন সোলেমান নবী।

আমি পারবো না?

পারবে বৈকি। যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কেউ নেই–চকোলেট কেনবার পয়সা নেই– খুব কষ্ট যাদের তারা পাখি হয়ে যায়। তখন আর কোনো ভাবনা থাকে না। তাই বাচ্চাদের সঙ্গে পাখিদের এত ভাব।

ও বুঝেছি। তাই বুঝি আমার মাথার ওপরে চড়ুইগুলো বাসা করে, আব্বা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই।

জরিনা কান পেতে থাকে পাখিদের কোনো সাড়া শব্দ যদি জেগে ওঠে। সাদেকও তন্ময় হয়ে থাকেন। কিন্তু আর ওরা ডাকে না। সাদেক জরিনার কাঁধে হাত রেখে নির্বাক হয়ে বসে থাকেন।

৩. এই সন্ধ্যার কথা

এই সন্ধ্যার কথা আজো ভুলতে পারেনি জরিনা। এই সন্ধ্যা তার জীবনে একটা স্বপ্ন জাগরণের মাঝপথে একক বেদনাময় একটি অনুভূতি হয়ে আছে। যে অনুভূতি জন নিয়েছিল সেই সন্ধ্যায় সেই পাখি, সেই জানু, সেই কণ্ঠস্বর আর কোনদিন ফিরে এলো না। জীবনের দূর–সমুদ্রে সরে যেতে যেতে সেই সন্ধ্যা তার স্মরণে আসে ইস্কুলে পড়া নাম ভুলে যাওয়া এক ইংরেজি কবিতার ঝোড়ো রাত্রিতে বাতিঘরের মতো।

এই সন্ধ্যার কথা প্রথম বড় করে মনে পড়েছিল কলকাতার বাসায় চিলেকোঠায় দাঁড়িয়ে একদিন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে। তখন নূরুন্নাহারের বিয়ে দিয়েছেন সাদেক। জরিনা তখন সবে এগোরোয় পড়েছে। আর রোকসানা সংসারে এসেছে সপ্তাহ খানেক হলো।

প্রথম রাতে শোবার ব্যবস্থা হল আলাদা ঘরে। পাশের কামরায়। মা মারা যাবার পর এই তিন বছর সে ছিল সাদেকের কাছে। আজ তার মন ভীষণ ম্লান হয়ে গেল। ক্ষুব্ধতা নয়, বিষণ্নতা। বিষণ্নতায় ম্লান হয়ে সে খাবার টেবিলে বসে রইলো অনেকক্ষণ। তখন রোকসানা তার পাশে এসে দাঁড়াল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিল খানিক। বলল, ঘুম পাচ্ছে?

এক মুহূর্তে তার বিষণ্নতার মেঘ কেটে গেল। হঠাৎ একটা খুশির ঝাঁপটায় মন হয়ে উঠল রেশমি। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জরিনা বলল, না।

না! এত রাত অবধি জেগে থাকো নাকি তুমি? ছিঃ। আজ থেকে ঠিক দশটার সময় ঘুমুতে যাবে, কেমন?

তারপর বড়ো খাটে রোকসানা আর জরিনা গিয়ে শুলো। রোকসানা কত কী বলল, শুধোল– জরিনা যতক্ষণ পারলো উত্তর দিল তার। এই নতুন মানুষটার গাত্রবাস কেমন ছড়ানো ছড়ানো, আবছা। কোনদিন যাকে জানতো না, আজ সে ঠিক তার পাশাপাশি। জরিনা আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল কখন। ঘুমুতে ঘুমুতে মনে পড়লো, হাসপাতালে শেষ দিন যখন সে গিয়েছিল তখন মা তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছিলেন। আচমকা ডান হাত মার পেটের ওপর পড়ে গিয়েছিল– কেমন উঁচু আর শক্ত, তাল তাল। লজ্জায় সরিয়ে আনতে পারেনি। কাঁধ গলা আড়ষ্ট হয়ে এসেছিল তার। আর সেই অবস্থায় মার কাঁধের ওপর মুখ রেখে ভারী মিষ্টি একটা ঘ্রাণ, মনে করতে পারছে না এমনি কী একটা হারিয়ে ফেলা সুগন্ধ পেয়েছিল জরিনা।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে জরিনা প্রথমটা মনে করবার চেষ্টা করে কোথায় আছে সে? তার নতুন শোবার ব্যবস্থার কথা মনে পড়ে একটু একটু করে। তারপর ডানে বামে হাত। বুলিয়ে দেখে ফাঁকা। একা সে শুয়ে আছে। এক মুহূর্তের জন্যে ভয় করে তার। কিন্তু তা এক মুহূর্তের জন্যই। জানালা দিয়ে আবছা আলো এসে পড়েছে ঘরে। আর তার ভয় করে না। ভয়ের বদলে আক্রোশ জন্ম নেয়। আস্তে আস্তে উঠে চুপ করে বসে থাকে জরিনা।

তারপর বিছানা থেকে নেবে এসে দরোজার ফাঁক দিয়ে ও–ঘরে উঁকি দেয়। কিছু দেখা যাচ্ছে না। কেবল এখানে ওখানে কুয়াশার মতো আলোর পোচ। দরোজা একটু ঠেলতেই শব্দ করে ওঠে। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে জরিনা। বুকের ভেতর চিব ঢিব করতে থাকে। আবার উঁকি দেয়। একটু পরে আঁধার সয়ে এলে তার চোখে পড়ে সাদেক আর রোকসানা পাশাপাশি শুয়ে আছে। অনেকটা মিউজিয়মে দেখা মমির মতো। রোকসানার একটা হাত সাদেকের বুকের ওপর বিছিয়ে আছে, এলানো চুলের গভীরে তার মুখ ডুবে আছে। আর সাদেক আধো পাশ ফিরে শুয়ে আছেন রোকসানার দিকে মুখ করে।

মুখ ফিরিয়ে নিল জরিনা। সারা গা শিরশির করে উঠলো জ্বরে পাওয়ার মতো। কুটি কুটি করে ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো রোকসানার পরনে খয়েরি শাড়িটা। ইচ্ছে হলো, ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় তাকে। কী দরকার ছিল রাতের বেলায় তাকে অত আদর করবার? কেন তাকে সে ঠকালো? দরোজা থেকে ফিরে এসে ঘরের মাঝখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো জরিনা। রোকসানাকে নিজের চেয়ে অনেক বড়, অনেক শক্তিশালী, অনেক দূরের মনে হলো তার। বাষ্পের মত ফুঁপিয়ে ওঠা করুণায় কান্নায়, আজ রাতেই মরে যাওয়ার ইচ্ছায় সে এ লশে মাথা রাখলো।

.

পরদিন ভো।রবেলায় নাশতার টেবিলে দুজনের কারো দিকে তাকাল না জরিনা। কোনো কথা বলল না। কেবল চায়ের পেয়ালটা নিজের দিকে টেনে নিল। আলীজাহ্ বসেছিল তার পাশে। সে বলল, ও–কী! বিস্কুট ডিম এগুলো খাবে কে?

সাদেক রোকসানাকে বললেন, দাও, ওকে এগিয়ে দাও।

রোকসানা দুটো প্লেট এগিয়ে দিল। সবাই ব্যস্ত হলো নাস্তায়।

হঠাৎ রোকসানা চোখ তুলে দেখে জরিনা কিছুই ছোঁয়নি। চায়ের পেয়ালা দুহাতে ধরে আছে। শুধালো, যাচ্ছো না যে!

খাবো না।

জরিনা চায়ের দিকে তাকিয়ে উত্তর করে। আরো জোরে চেপে ধরে পেয়ালাটা। গরম লাগে হাতে। তবু কিছুই মনে হয় না। ইচ্ছে হয়, চিৎকার করে বলে ওঠে, খাবো না, না, না। কিন্তু চিৎকার করতেও প্রবৃত্তি হয় না তার। সে বুঝতে দেবে না কী তার হয়েছে, বুঝতে দিয়ে দাম বাড়িয়ে দেবে না রোকসানার।

হাতের তালু অবশ হয়ে আসে।

সাদেক বলেন, আলীজাহ্ দিকে তাকিয়ে, অসুখ করেনি তো?

আলীজাহ্, জরিনার দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়, না–না। আমি বুঝেছি। সেই রবিনসন ক্রুসোর ছবিওয়ালা বাক্সের বিস্কুট চাই জরিনার। তাই না? দুপুরে এনে দেব।

সাদেক উঠে যেতে যেতে বলেন, উঁহু, মনে হচ্ছে অসুখ-বিসুখ। তুমি বেরুবার সময় ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেও, আলী।

সেদিন ও স্কুলেও যায়নি। বিকেলে নামলো বৃষ্টি। তখন ঈঠে এলো ছাদে। বড় বড় গাছ দোলানো, আকাশ নেভানো বৃষ্টি। কেবল দিগন্তের কাছে বলয়ের মতো এক ফালি উজ্জ্বলতা। আর বাতাস। নিম গাছের বড় ডালটায় দুটো কাক ভিজে ভিজে সারা হচ্ছে। আর চারদিক থেকে কী একটা আয়োজন যেন ক্রমেই উত্তাল হয়ে উঠছে। জরিনাব মনে হলো, এই তার আপন পৃথিবী। কতকাল ধরে সে অপেক্ষা করছে এমনি একটি বৃষ্টির- যে বৃষ্টি তাকে ধীরে ধীরে নিয়ে আসে ছাদে, যে বৃষ্টিতে ভেজা যায়, যে বৃষ্টির আড়ালে সাদেক, রোকসানা, আলীজাহ্ সবাই দূরে সরে যায়।

চিলেকোঠার দরোজায় দাঁড়িয়ে তখন মনে পড়লো সেই চড়ুই দেখা, বাবার জানুতে মাথা এলানো সন্ধ্যাটার কথা। মনে হলো আজকের জরিনা থেকে অবিকল একটা শরীর, একটা নিখুঁত প্রতিচ্ছবি, আলাদা হয়ে গেছে এক সময়ে। তাকে সে চিরদিনের মতো রেখে এসেছে সেদিনের সেই সন্ধ্যায়।

জরিনা চিলেকোঠার বাইরে এসে দাঁড়াল। দাঁড়াল বর্শার মতো তীক্ষ্ণ আর ঠাণ্ডা বৃষ্টিতে। সারা শরীর কন্টকিত হয়ে উঠলো ঠাণ্ডায়। চামড়ার কোমলতা ফেটে ফেটে পড়তে চাইলো বৃষ্টির আঘাতে। প্রথমে তীব্র ব্যথা, তারপর সেই ব্যথা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়বার পর আর কোনো বোধ তার রইলো না। একরোখা সে দাঁড়িয়ে রইলো বৃষ্টির

www.bengaliebook.com

আঘাতের ভেতরে। একটা হিংস্র শক্তি যেন আজ তার ভেতরে জন্ম নিয়েছে। আর কোনো কিছু তাকে এখন ফেরাতে পারবে না। সে এখানেই থাকবে।

সেদিন রাতে খাওয়া শেষ হলে পর জরিনা সোজা তার নিজের কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। একটু পরেই রোকসানার পায়ের শব্দ কানে আসতেই জোর করে চোখ বুজে নিঃসাড় হয়ে। থাকলো। শব্দ শুনে বুঝতে পারলো রোকসানা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। একবার লোভ হলো চোখ মেলে তাকে দ্যাখে। কিন্তু না, চোখ সে খুলবে না।

চোখ মেলে দ্যাখে রোকসানা বাতি নিভিয়ে দিয়ে চলে গেছে। জরিনা নিঃশ্বাস ফেলল।

পরদিন রাতেও ঠিক তেমনি। রোকসানা এসে ফিরে গেল তবু চোখ খুলল না জরিনা। ঘুমের ভান করে বালিশে মাথা ডুবিয়ে পড়ে রইলো।

কিন্তু কালকের মতো আজ ঘুম এলো না সহজে। শুয়ে শুয়ে সে শুনতে পেল সাদেক ও ঘরে এসে হাই তুললেন, কথা বললেন রোকসানার সঙ্গে। একবার জরিনার কথা জিজ্ঞেস করলেন, তখন বুক শুকিয়ে গেলো জরিনার। তারপর তিনি শুয়ে পড়লেন। ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে এতক্ষণ সরু একফালি আলো এসে পড়ছিল, টুক করে তা অন্ধকার হয়ে গেল।

আলীজাহ্ বার থেকে ফিরলো বেশ খানিকটা রাতে। বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল, খুট করে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো জরিনা।

আলীচাচা।

স্-স্-স। বাবা ঘুমিয়েছে?

জরিনা ফিসফিস করে বলে ঘাড় কাত করে, হু! সবাই।

যা ঘুমোগে-জেগে থাকে না। বলতে বলতে আলীজাহ্ নিজের কামরায় চলে যায়। তার কালো ট্রাউজার অন্ধকারে একটু পরেই যায় মিলিয়ে, কিন্তু শাদা শার্ট বারান্দার শেষ মোড় অবধি দেখা যায়। জরিনা ঘরে ফিরে যায় না। পা টিপে টিপে এগোয়।

আলীজাহ্ মুখ ফেরাতেই ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শব্দ করে হেসে ওঠে জরিনা।

উঁহু, কী দুষ্টুমি হচ্ছে রাত দুপুরে।

না, ঘুম পাচ্ছে না।

বোস তাহলে।

আলীজাহ্ খুব করে জরিনার মাথার চুলগুলো নেড়ে দেয়। তারপর শার্ট খুলে আলনায় ছুঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়ে বলে, অ্যাকটিং দেখবি?

অ্যাকটিং করে এলে, না আলীচাচা?

রিহার্সেল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখব। উঁহু অত কাছে এসো না, আমার ভয় করে।

আলীজাহ্ একবার তার সম্মুখে এসে তারপর দুহাত পেছনে বেঁধে পিছিয়ে যায় কয়েক পা। জরিনা অবাক হয়ে বড় বড় চোখ মেলে অপেক্ষা করে। দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ হয়ে থাকে আলীজাহ্ দীর্ঘ দেহের ওপর। আরো দীর্ঘ, আরো দূর মনে মনে হয় হঠাৎ তাকে। হাতের পেশী দৃঢ় হয়ে ওঠে, চাপটা হয়ে প্রায় সেঁটে যায় দুপাজরায়। তীক্ষ্ণ নাসারেখার দুপাশে হাড় ফুটে উঠতে চায় নিঃশ্বাসরে র আবেগে। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে ঘুরে আলীজাহ্ হেসে বলে, সম্রাট শাহজাহান। সিংহাসনের লোভে ছেলেরা তাকে বন্দি করে রেখেছে আগ্রা ফোর্টে। বুড়ো হয়ে গেছেন, প্যারালিসিসে এব.দক অবশ, সেই তখন–

সঙ্গে সঙ্গে আলীজাহ্ শরীরে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দেয়। কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে আসে শরীর, ডান হাত আর ডান পা সেই শরীর থেকে ঝুলতে থাকে অর্কিড লতার মতো। আর ছুরির মতো জ্বলতে থাকে দুচোখ। কাঁপতে থাকে চোয়াল। আলীজাহ্ দারুণ আক্রোশে সারা মেঝেয় তার দেহ টেনে টেনে চলতে থাকে। সংলাপ বলে। তার কিছুই কানে যায় না জরিনার। সে শুধু আলীজাহ্‌কে দেখে। আলীজাহ্ তার কাছে এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়ায়। তখন অস্পষ্ট হয়ে আসে যেন তার মুখ! জরিনার মনে হয় সম্রাট

শাহজাহান–দি এমপেরর হু বিলটু তাজমহল– তার সমুখে অতীত থেকে এসে দাঁড়িয়েছেন। সম্রাট তাকে অবলোকন করছেন ক্লান্ত দুচোখের পাতা তুলে। হয়ত চিনতে পারলেন না। কিংবা এতই তিনি আত্মমগ্ন যে তার উপস্থিতি তিনি অনুভব করতেও পারলেন না। জরিনা কাঠ হয়ে বসে রইলো। সম্রাট তখন পঙ্গু শরীরটাকে টেনে টেনে দূরে সরে গেলেন।

আলীজাহ্ স্পিংয়ের মতো শরীরটাকে ছেড়ে দিযে ডান হাত দুবার ঝেড়ে সমুখে এলো হাসি মুখে! তখন জরিনার শাদা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, যেন এতক্ষণ তার হৃদস্পন্দন, তার রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে ছিল। বলল, ইস, এত সুন্দর তুমি করতে পারো।

তাই নাকি?

সত্যি।

হয়েছে হয়েছে। খেয়েছিস?

নিচে খাবার টেবিলে আলীজাহ্ উল্টোদিকে বসে টেবিলে থুতনি লাগিয়ে বসে থাকে জরিনা। আলীজাহ্ খেতে খেতে বলে, শাহজাহান কিন্তু ভাত খেত না। পোলাও দুবেলা পোলাও, রোস্ট, এইসব। বাদশাহ ছিল কিনা। আসল বাদশাহ, থিয়েটারের না।

জরিনা খিলখিল করে হেসে ওঠে। হাসিতে ভেঙ্গে পড়তে চায়।

আহ্‌, পানির গ্লাসটা ফেলে দিবি যে।

জরিনা তখন থামে। পানির কথা ওঠায় গ্লাসের দিকে তাকিয়ে দেখে। তারপর নিজেই ঢকঢক করে খানিকটা পানি খেয়ে নেয়। একটু হাসে। সারাটা বাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে। কোনোখানে কোনো শব্দ নেই। শুধু রাত। জরিনার মনে হচ্ছে যেন আজ হঠাৎ একটা ভারী খুশির খবর মিলেছে তার। আজ যা খুশি সে তাই করতে পারে।

শোবার ঘরে ঘড়িতে একটা বাজার ঘন্টা দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে মিলিয়ে গেল।

আলীজাহ্‌ হাত ধুয়ে বলে, একটা বাজলো না দেড়টা?–মেলা রাত হয়েছে তো। চল চল।

চোখ তো টেনে আসছে, তবু বসে আছিস!

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে দুজন। এতক্ষণে ঘুম পাচ্ছে জরিনার। সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠবার সময় কেবলি পিছিয়ে পড়ছে সে। আলীজাহ্‌ তাকে কোলে তুলে নেয়। জরিনা তার গলা জড়িয়ে ধরে থাকে। তখন জরিনার আর কোন অনুভব থাকে না এই অতিবাহনের। মনে হয় এমনি করে দোতলা ছাড়িয়ে, সব দালান ছাড়িয়ে, ক্রমাগত সে কোমল একটা আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। আলীজাহ্‌ গলা আরো ভাল করে জড়িয়ে ধরে সে।

.

এরপর থেকে এমন হলো, রোজ রাতে জেগে থাকতো জরিনা যতক্ষণ না আলীজাহ্ ফিরে আসে। তারপর দুজনে মিলে খাবার টেবিলে গল্প। জরিনার সমস্ত দিনের হাজার কথা আর কাজ, ভাবনা সব বলা চাই আলীজাকে। যে কথা সে বলতে পারে না সারাটা দিন আর যে কথা বলা যায় না তা নির্ভয়ে বলা যায় একমাত্র আলীজাকে। দিনের বেলায় যা চাপা থাকে, বিরূপ পৃথিবী থেকে যা সযতে লুকিয়ে রাখে জরিনা, রাতের এই মুহূর্তগুলোয় তা বেরিয়ে আসে আকাশের এই অত নক্ষত্রের মতো একে একে, ছোট ছোট, জ্বলন্ত। জরিনা অনুভব করতে পারে একটা নিবিড় যোগসূত্র। আলীজাহ্ তার কাছে একান্ত হয়ে ওঠে। কাউকে জানায় না সে রাতের এই মুহূর্তগুলোর কথা। সাদেক, রোকসানা কাউকে না। এ তার একান্ত, নিজস্ব।

সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন দুজনে খাবার টেবিলে, মুখোমুখি। মাথার ওপর জ্বলছে বালব। আলীজাহ্ যখন মুখ নিচু করে খেতে থাকে তার ছায়া এগিয়ে এসে পড়ে টেবিলের মাঝামাঝি। জরিনা একেকদিন, তখন সমুখে ঝুঁকে পড়ে নিজের ছায়া দিয়ে স্পর্শ করতে চায় ঐ ছায়াটাকে–আর কথা বলে। যেন রাত্রির নিবিড় থেকে উঠে এসে তারা দুজন একটা গোপন ষড়যন্ত্রে মিলিত হয়েছে। জরিনার তখন মনে হয়, এই টেবিলে এসে মুখোমুখি বসার মুহূর্তে, এখন থেকে যতক্ষণ তারা এখানে বসে থাকবে–এই বসে থাকা, এই ছোট ছোট হাসি, এই কথা, এই উষ্ণতা এটাই বাস্তব, আর সারাটা দিন, দিনের চলাচলে সমস্ত কিছুই স্বপ্ন মরে থাকা।

.

আলীজাহ্ সেদিন রাতে ফিরে এসেই বলে, কাল এক জায়গায় যাবি?

কোথায় আলীচাচা?

গেলেই দেখতে পাবি।

বলো না।

বলছি, বলছি। পাখাটা ছেড়ে দিই আগে, যা গরম পড়ছে আমার এক বান্ধবীর জন্মদিন কাল। পার্টি হবে। তোকে নিয়ে যাবো। যাবি?

হ্যাঁ। ঘাড় কাত করে জরিনা সম্মতি জানায়। পাখার বাতাসে মাথার চুল ফিনফিন করে উড়তে থাকে। মনটাও তার অমনি দ্রুত সচল হয়ে ওঠে। ছাদের ওপর একেকদিন দমকা বাতাসের মুখে জামা–কাপড় পেছনে পত পত করে উড়িয়ে ঠেলে ফেলে দিতে চায়, তেমনি অস্থির এখন তার কল্পনা। দুচোখে সে স্পষ্ট দেখতে পায় এক অজানা বিরাট বাড়ির সমুখে বাড়ির রঙ নিশ্চয়ই শাদা– সবুজ ঘাস চুলের মতো করে ছাঁটা লনে পার্টি হচ্ছে। বাবার সঙ্গে সে কয়েকবার কয়েকটা পার্টিতে গেছে। কিন্তু সে সব পার্টি ছিল অন্য রকম। সব ব্যস্তসমস্ত মানুষ শেরোয়ানি পবে, স্যুট পরে ভিড় জমাতো। অদ্ভুত ব্যস্ততা, যেন তাড়া খেয়ে ফিরছে সবাই। আর শক্ত শক্ত কথার ছড়াছড়ি, মুখ কঠিন করে, কপালে ভাঁজ তুলে গম্ভীর সব আলোচনা। একটুও ভালো লাগত না জরিনার।

জরিনা যেন জানে, যদিও সে কোনদিন কোন জন্মদিনের পার্টিতে যায়নি–এখানে থাকবে না ব্যস্ত মানুষের আনাগোনা। থাকবে আলো, রঙিন বাতি আর সুখী, সুগন্ধ ছড়ানো মানুষ যেমন সে ছবিতে দেখেছে। এমন কি খুব ধূসর করে মনে পড়ল সেই কয়েকটা মহিলার মুখ যারা নূরু আপাব বিয়েতে এসেছিল এপাড় ওপাড়া থেকে যাদের কয়েকজনকে কী ভালো লেগেছিল জরিনার। তার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো তাদের কথা মনে করে। সে ভাবলো কাল পার্টিতে তারাও হয়ত আসবে। আবার সে দেখতে পাবে ওদের।

একটু পরে হঠাৎ দপ করে সব নিভে গেল। খাবার টেবিলে ম্লান মুখে সে বসে রইল খানিক। তারপর চিবুক তুলে আলীজাহ্ দিকে তাকালো। আলীজাহ্ কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ওর দিকে তাকিয়ে শংকার ছায়া মেশানো কণ্ঠে শুধালো, কী হয়েছে?

মাঝে মাঝে এমনি নিভে যেতে সে দেখেছে জরিনাকে। জরিনা মাথা নাড়ে। মুখে বলে, কাল কখন যাবে?

বিকেলে। বিকেল ঠিক সাড়ে পাঁচটায়।

আলীজাহ্ হালকা গলায় উত্তর করে, এবং চোখে প্রশ্ন নিয়ে তবু তাকিয়ে থাকে জরিনার দিকে।

একটু পরে জরিনাই প্রশ্ন করে, আচ্ছা আলীচাচা, জন্মদিন কেন?

প্রশ্নটা চট করে আলীজাহ্ বুঝতে পারে না। পরে বলে, বয়স একটা বছর বাড়লো সেই কথাটা মনে রাখবার জন্যে। যেমন তুই দিনে দিনে বড় হচ্ছিস, একদিন আর ছোট থাকবি না, তেমনি।

তাহলে সবাই কেন যাবে?

এ প্রশ্নটাও আলীজাহ্ বুঝতে পারে না। জরিনার দিকে গভীর চোখে খানিক তাকিয়ে থাকে। খুব আস্তে একটু পরে উত্তর করে, তুই আমি সবাই যাবো, সারাটা জীবন যেন তার সুন্দর করে কাটে, এই ইচ্ছে নিয়ে।

তবু তার মনে হলো যেন যথেষ্ট বলা হলো না। তাই সে আবার গোড়া থেকে শুরু করলো, যে মাসের যে তারিখে জন্ম, সেই মাস সেই তারিখ প্রত্যেক বছরে ফিরে আসে। তার মানে আমরা এক বছর বড় হই, একটা বছর পেরিয়ে আসি। এমনি করে সারা জীবন।

আলীজাহ্ নিজের কাছেই কথাগুলোর অর্থ খুব স্পষ্ট হয় না। সে ভাবতে থাকে আর কী বলা যেতে পারে। জরিনা অন্যমনস্ক হয়ে শুধোয়, তারপর একদিন মরে যাবে, না? জন্মদিনে কেউ মরে যায় না আলীচাচা?

আলীজাহ্ চকিতে চোখ তুলে তাকে দেখে নেয়, পরে দ্রুত সারামুখে হাসি ছড়িয়ে বলে, ও, এইকথা। এইসব ভাবছিলি এতক্ষণ? মানুষ তো মরে যায়ই, জন্মদিনেও মরে যায়। জন্মদিনে যারা মরে তারা ভাগ্যবান।

কেন?

হঠাৎ বিব্রত হয়ে পড়ে। তাইতো? কেন? বলে, মানে, তাদের আর ভাঙ্গতি হিসেব করতে হয় না। শুধু বছরের হিসেব, তাই। চট করে বলে দেয়া যায় এত বছর বয়সে উনি মারা গেলেন। আর অন্যদের কত অসুবিধে। বলতে হবে, কত বছর, কত মাস, কদিন। তাই না?

তুমি কাউকে মরে যেতে দেখেছ, আলীচাচা?

দেখেছি।

কাকে?

আলীজাহ্ মনে পড়ে জরিনার মার কথা। বলে, তুমি চিনবে না। কেন?

জরিনা আবার থুতনি টেবিলে নামিয়ে আনতে আনতে বলে, এমনি। মা যখন মরে গেল আমি ইস্কুলে। আমি দেখিও নি। আবছা আবছা জরিনার মনে পড়ে শাদা চার দেয়াল হাসপাতালের কামরা আর মার শরীরে টেনে দেয়া ভারী চাঁদরটার কথা।

কেমন করে মরে যায় আলীচাচা?

অসুখে।

তারপর?

তারপর– মরে যায়। আত্মা আকাশে চলে যায়।

জরিনা একটু ওপরে তাকায়। পরে চোখ নামিয়ে এনে শুধোয়, কেমন করে? তুমি তো দেখেছ বলো না।

সব কিছু হারিয়ে যেতে থাকে তখন এই আলো, গাছ, মানুষ–সব কিছু। সবচেয়ে বড়ো যে হারিয়ে ফেলা, সেটাই জীবন। যখন সময় হয়, তখন মানুষের মন খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সব কিছু দেখতে চায়, ধরতে চায়, ধরে রাখতে চায়, কিন্তু পারে না। আস্তে আস্তে আকাশের আলো সন্ধ্যের মতো হয়ে আসে। বৃষ্টি হলে যেমন দূরের সব কিছু ঝাঁপসা হয়ে যায়, তেমনি সব ঝাঁপসা হয়ে মিশে যায়। কাউকে দেখতে পায় না। বুকের ভেতরে

নিঃশ্বাস কাঁপতে থাকে। আঙুলের ডগা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। তখন খুব ক্লান্ত লাগে। তখন আর কিছু মনে থাকে না। তখন মানুষ মরে যায়।

জরিনা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তার মনে হয়, মানুষ মরে না গিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না? একটা চারদিক বন্ধ বড় কাঁচের বেলুন যদি সে পেত, তাহলে তার ভেতরে গিয়ে বসে থাকত, উঠে যেত আকাশের অনেক ওপরে। তাহলে হয়ত সে কোনদিন মরে যেত না। বহুদিন অনেকদিন সে বেঁচে থাকতে পারতো।

আলীজাহ্ উঠে দাঁড়িয়ে রোজকার মতো তার চুলে আঙুল দিয়ে ব্রাশ করে, নাড়া দিয়ে বলে, চল, আমার ঘরে যাবি। আজ ঘুমুলে চলবে না। নতুন রেকর্ড এনেছি, শুনবি চল।

আলীজাহ্ ওর মনের মেঘ দূর করতে চায়। সিঁড়ির নিচে এসে বলে, দুটো করে সিঁড়ি একবারে। পারবি?

খু–ব।

দেখি তাহলে। কুইক। হ্যাঁ, ওয়ান–টু থ্রি।

ওপরে উঠে জরিনা হাঁপাতে থাকে। হাতের পিঠ দিয়ে নাক ঘষে দম নিয়ে হেসে ফেলে।

নিচে আলীজাহ্ দিকে তাকিয়ে বা হাত নেড়ে বলে, তুমি কিন্তু তিনটে করে আসবে।

এসো।

আলীজাহ্ উঠতে থাকে। ভান করে, যেন তার খুব কষ্ট হচ্ছে। জরিনা আবার হেসে ওঠে।

.

বাড়িটা ঠিক যেমন ভেবেছিল তেমনি শাদা। সমুখে লন। আর মানুষ। আর বাতি খুব কম, এখানে ওখানে। তবু মনে হয়, কোথাও আলোর অভাব নেই এতটুকু।

জরিনা আর আলীজাহ্ যখন গাড়ি থেকে নামলো তখন প্রায় সবাই এসে গেছে। জরিনার পরনে শাদা সাটিনের কামিজ। কদিন আগে চুল ট্রিম করা হয়েছে কাঁধ অবধি; মাথার ওপরে একটা লাল টেপ বো করে বাঁধা। বেরুবার আগে আলীজাহ্ চেয়ারে বসে তাকে দুহাটুর মধ্যে এনে কপালের ওপরে ছোট ছোট চুলগুলো টেনে দিয়েছে, ঝালরের মত এখন তারা চুমু খেয়ে আছে তার চওড়া কপাল। জরিনার চোখ আবেগে উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ, আলীজাহ্ নিবিড় প্রীতিতে মন নির্ভয়।

লনের মাঝামাঝি চেরা–সিঁথি পথ গেছে বারান্দার দিকে। গাড়ি থেকে নেমে আলীজাহ্ জরিনাকে হাত ধরে নামালো। তারপর কাঁধে তার বিশাল করতল রেখে বলল, স্মিত মুখে, নিচু গলায়, এখানে।

জরিনা আলীজাহ্ দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফেরাল সমুখে। সমুখে এক দম্পতি– তারাও যাচ্ছিল বাবান্দার দিকে, পরস্পর নিবিড় হয়ে। লোকটার বাঁ হাতে মহিলাটির মুঠো। আর তার খোঁপার বন্ধনমূলে চাঁদের মতো আধখানা বেরিয়ে আছে শাদা ফুলের মালা।

জরিনার ভালো লাগল তার চলার ছন্দ। সে একবার চোর–চোখে তাকাল আলীজাহ্ দিকে। আস্তে আস্তে কাঁধ থেকে সরিয়ে দিল আলীজাহ্ করতল। তারপর মুঠো করে ধরলো। আলীজাহ্ তর্জনী আর মধ্যমা।

বারান্দার সিঁড়ির ওপরে যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল– জরিনা তাকে দূরে থেকেই দেখেছিল দীর্ঘ, ফর্সা, লাল উজ্জ্বল পাড়হীন শাড়ি পড়া, সে আলীজাকে দেখে সুন্দর একটা ভঙ্গিতে এক ধাপ নেমে এসে কলকণ্ঠে বলে উঠল, আসুন, ইস, এত দেরি। তারপর জরিনাকে দেখে, জরিনার চিবুক স্পর্শ করে বলল, ঝুঁকে পড়ে, কী নাম?

জরিনা আবছা গলায় উত্তর করল তার। মেয়েটি মুখ সরিয়ে নিতেই জরিনার এক মুহূর্তের মেঘ কেটে গেল অন্ধকার ঘরে বিজলি বাতি জ্বলে ওঠার মত। যে লাল শাড়ির ঔজ্জ্বল্য খুব কাছাকাছি এসে তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন। করেছিল তা অপসারিত হলো। সে তখন সম্পূর্ণ করে তাকে দেখল, মুগ্ধ হলো।

আলীজাহ্ বললো, এরই জন্মদিন। বুঝলি?

জানি।

আলীজাহ্ তাকে নিয়ে এগিয়ে গেল আরো ভিড়ের ভেতর। আলীজাহ্ উপস্থিতিতে হঠাৎ যেন মৌমাছি হয়ে উঠল সবাই। জরিনা তাকিয়ে দেখে। তার গর্ব হয়। তার আলীচাচা, এ যেন তারই অহংকার। আলীজাহ্ আঙুল ধরে নিবিড় হয়ে সে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

এত সুন্দর মানুষের ভিড়। কাপড়ের, ফুলের, শাড়ির গন্ধ। আর মানুষের গাত্রসৌরভ। আর কণ্ঠস্বর। আর আলো। তার আশ্চর্য লাগে। স্বপ্ন থেকে উঠে আসা কোনো মুহূর্তের মতো মনে হয়।

জরিনাকে গিয়ে আলীজাহ্ নিয়ে বসল একটা সোফায়। আলীচাচাকেও আজ তার কী দীর্ঘ মনে হচ্ছে। চারদিকের এত কোলাহল, গতি, কথা, কিছুই তার চোখে পড়ছে না। কিছুই সে শুনছে না, নিতে পারছে না আলাদা করে কোনো কিছুই। সব কিছু এক হয়ে তার মনের ভেতরে এঁকে যাচ্ছে একটি মাত্র ছবি।

পাশ থেকে নরোম একটা হাতের স্পর্শে জরিনা তাকিয়ে দেখল যার জন্মদিন সেই লাল শাড়ি পরা মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণ সে বারান্দা আর ড্রইং রুমের একোণ থেকে ওকোণ অবধি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কখন এসে দাঁড়াল তার পেছনে? মেয়েটি গ্রীবা বাঁকিয়ে সুরেলা গলায় শুধালো, কেমন?

জরিনা কী করবে ভেবে উঠতে পারল না। ও তাকে এতখানি মুগ্ধ করেছে যে ওর সমুখে কেমন ভেতর থেকে সব কিছু সঙ্কুচিত হয়ে আসছে।

আলীজাহ্ তার কনুইয়ে ঠেলা দিয়ে বলল, যা না।

বাবা, আপনি যা কথক মানুষ আর তার ভাইঝি এমন?

তাহলে তুমি ওকে চিনতেই পারো নি। আলীজাহ্ বলল জরিনার দিকে মুখ আধো নামিয়ে, আমার সঙ্গে যা গল্প করে তুমি যদি শুনতে।

হবে না। আপনারই ভাইঝি তো।

বাহ্, আগেও দোষ পরেও দোষ। বেশ তো।

মেয়েটি কাঁচভাঙ্গার অনুকরণে হেসে উঠলো কথা শুনে।

ঠিক তখন কারা দুজন এদিকে আসছিল আলীজাহ্‌কে দেখে, আলীজাহ্ উঠে দাঁড়াল। কথা বলতে লাগল। নাটকের কথা, ফিল্মের কথা, অনেকের কথা, যাদের জরিনা চেনে না।

জন্মদিন–মেয়েটি তখন তার পাশে এসে বসলো। জরিনাকে কাছে টেনে নিয়ে, এত ভাল লাগল তার তখন, সে বললো, লক্ষ্মী মেয়ে তুমি, কী পড় বললে না? কোন স্কুলে?

স্কুলের নাম বলল জরিনা। হঠাৎ হালকা হয়ে গেল তার বুকের ভয়টুকু। সে কথা বলতে লাগল –অনর্গল, দ্রুত, চোখ হাত নেড়ে, নাচিয়ে?

বাহ, চাচার কাছে থেকে তুমিও বেশ কথা বলতে শিখেছ। চাচা তোমাকে অ্যাকটিং শেখাবে না?

আমি শিখব না। ভালো লাগে না।

তাহলে কী শিখবে? হোয়াট ইউল বি?

আলীজাহ্ কথা বলতে বলতে দূরে সরে যাচ্ছে। জরিনা সেদিকে এক পলক তাকিয়ে দেখে উত্তর করল, আপনি পারেন?

কী?

অ্যাকটিং।

একটুকুও না।

আলীচাচা এত সুন্দর করতে পারে।

তুমি দেখেছ?

ক–ত।

আলীজাহ্ আরো দূরে সরে গেছে। ঠাৎ জরিনা প্রশ্ন করে, আপনার জন্মদিন আবার কবে হবে?

ওমা কেন?

মেয়েটি বিস্ময়ে ঠোঁট গোল করে আনে। চোখের মণি একটা সুন্দর ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থাকে।

আমি আসবো।

তুমি এমনি আসবে। রোজ আসবে, কেমন?

জরিনার লজ্জা করে। ঘাড় কাৎ করে উত্তর দেয়। একটু পরে মেয়েটি বলে, তুমি বসো, আমি এই আসছি।

কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে যায় আর আসে না। মনটা প্রথমে উদগ্রীব হয়ে থাকে, পরে আস্তে আস্তে আস্তে নিভে যায়। তখন ম্লান চোখে দৃষ্টি করে ইতস্তত।

আলীজাহ্‌ও নেই।

একটু পরে জরিনা উঠে দাঁড়ায়। এদিকে ওদিকে তাকাতে থাকে। একটা ছোট্ট দলের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে। কারো চোখে পড়ে না। জরিনা এগোয়, এতক্ষণে আলীজাকে সে দেখতে পেয়েছে।

দূরে, বারান্দার একেবারে শেষ মাথায়, কয়েকটা সবুজ পাতা গাছের সঙ্গে পিঠ ছুঁইয়ে আলীজা দাঁড়িয়ে আছে। আর তার সমুখে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে তিনজন মহিলা। কী কথা বলছে কে জানে। এতদূরে থেকে ওদের হাসি ছড়ানো মুখ শুধু চোখে পড়ে। আলীজাহ্ ঝুঁকে পড়ে ডান হাতের তর্জনী দুলিয়ে একজনকে অনেকক্ষণ ধরে কী যেন বলছে। বলা শেষ হলো। হেসে উঠল সবাই।

জরিনা আরো একটু কাছে এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সব। হঠাৎ নিজেকে খুব ছোট মনে হলো তার। আলীজাহ্ ওপর রাগ হলো। রাগ হলো ওই তিনটে মহিলার ওপর। মনে হলো, এক্ষুণি সে যদি চিৎকার করে উঠতে পারত না, চিৎকার নয়–এখন যদি ফিট হয়ে যেতে পারত, তাহলে খুব শাস্তি হতো ওদের। কিন্তু বহুবার জরিনা দেখেছে, যা চাওয়া যায় তা হয় না।

তাই কিছু বলবে না সে ওদের। সরে এসে এদিকের একটা থামের আড়ালে নিজেকে ঢেকে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল জরিনা। দাঁড়িয়ে পা সমুখে টেনে কোমর থেকে গোড়ালি অবধি একটা টান টান আবছা ধনুক সৃষ্টি করে রইলো।

৪. যুদ্ধের দ্রুত কলকাতা

যুদ্ধের দ্রুত কলকাতা।

বেরিয়ে এসে গাড়িতে বসে জরিনা বলেছিল, এখুনি সে বাসায় ফিরবে না। ঘুরে বেড়াবে। এসপ্ল্যানেড দিয়ে গাড়ি ছুটছে। ড্রাইভ করছে আলীজাহ্ আর জরিনা পাশে বসে।

অন্ধকার আকাশের নিচে কলকাতায় যেন অসংখ্য আলোর নৃত্য চলেছে। চকোলেট, র‍্যাপার, চুয়িংগাম আর ইউনিফর্মড হোয়াইটস। এত রাতে শহরে সে আর কোনদিন এমনি লক্ষ্যহীন ঘুরে বেড়ায়নি। আলীজাহ্ উদার দুহাত থেকে সে আজ মূল্যবান উপহার পেয়ে গেছে।

আর সমস্ত কলকাতা যেন শূন্য, বিস্তৃত, বিশাল একটা পটভূমি যেখানে এতকাল কিছুই হয়নি; আজ সেই পটভূমিতে নানা রঙের আলোর রেখা–দীর্ঘ এবং বিন্দু বিন্দু–আলোর বৃত্ত অবিরাম জ্যামিতির জ্বলন্ত নকসা এঁকে চলেছে। আর তাই দেখতে মানুষ ভিড় করেছে, অস্থির তাড়া খাওয়া মানুষ এখানে ওখানে ময়দানে, চৌরঙ্গিতে। একটা কটু কিন্তু মিঠে মিঠে জন্মান্তরের চেনা জ্বালাকর ঘ্রাণ বাতাসে গাড়ির দুপাশ দিয়ে হুহু করে বেরিয়ে যাচ্ছে। জরিনা নড়েচড়ে বসলো। আলীজাহ্ শুধালো, কিরে আরো বেড়াবি?

হুঁ।

মোমাছির গুঞ্জনের মতো হেসে উঠলো আলীজাহ্।

তার পায়ের চাপে দ্রুত উদ্দাম হয়ে উঠল গাড়িখানা। সমস্ত অস্তিত্ব থরথর করে কাঁপতে থাকে যেন আবেগে। জরিনার মন আশ্চর্য রকমে হালকা হয়ে যায়। অপূর্ব একটা খুশিতে টলমল করে ওঠে। আলীজাহ্ তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে বলে, চল দমদমের ওদিক ঘুরে আসি।

জরিনার দুই করতল তালি হয়ে উঠতে চায় আনন্দে, গতিতে, মুক্তিতে। সেই পার্টির কথা এখন তার একটুও মনে পড়ছে না। দিগন্তের আড়ালে দ্বীপের মত তলিয়ে গেছে যেন সবকিছু।

বাসায় যখন ফিরে এলো তখন বেশ রাত হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই। কেবল আলো জ্বলছে সাদেকের স্টাডিতে। আলীজাহ্ বলল, আব্বা পড়ছেন। ইস্ মেলা দেরি হয়ে গেল, নারে?

গ্যারেজের তালা খুলে আলীজাহ্ গাড়িটাকে এগিয়ে পেছিয়ে কাটিয়ে ভেতরে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, কেমন লাগল বল এবার।

ভালো।

কী ভালো?

জরিনা বুঝতে পারল না তার প্রশ্ন! তাকিয়ে রইল।

জন্মদিনের সেই মেয়েটিকে কেমন লাগল তাই জিগ্যেস করছি। খুব সুন্দর করে সাজতে পারে, কথা বলতে পারে, না?

হ্যাঁ–জানো আলীচাচা, আমাকে রোজ যেতে বলেছে।

কোথায়?

আলীজাহ্ বিস্ময়ে মুখটাকে প্রকট করে তোলে।

ওর ওখানে।

যাবি, বেশতো।

তোমার সঙ্গে যাবো। তোমাকে ওরা সবাই চেনে, না আলীচাচা?

আলীজাহ্ হাসলো অনেকক্ষণ ধরে।

গাড়ি ততক্ষণে গ্যারেজে ঢুকে গেছে। বেরিয়ে এসে আলীজাহ্ দরোজা বন্ধ করতে লাগল। জরিনা তার দুহাত দিয়ে দরোজার অন্য পাল্লা টেনে এনে ভিড়িয়ে দিল।

বাহ, খুব কাজের হয়েছিস তো। হাতে ব্যথা পেলি নাকি?

নাহ।

পরিশ্রমে, প্রশংসায় লাল হয়ে ওঠে জরিনার মুখ।

এই–ছি, ছি, সরে দাঁড়া জরিনা।

জরিনা চকিতে নিচে তাকিয়ে দেখে গ্যারেজের সমুখে সরু নালাটায় একটা ইঁদুর মরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। জরিনা মনে মনে শিউরে ওঠে– এ র‍্যাট, এ ডেড র‍্যাট। আর এ টি–র‍্যাট।

আলীজাহ্, জরিনার হাত ধরে বাসার ভেতর যেত যেতে বলে, ড্রাইভার কদিন হলো যা ফাঁদ পেতে রেখে গ্যারেজের চারদিকে। কটা মরলো কে জানে?

বড্ড বিশ্রী, আলীচাচা।

সেদিনের মতোই দুটো করে সিঁড়ি একসাথে ভাঙতে থাকে জরিনা। আলীজাহ্ একটা তালি দিয়ে বলে, আজ তিনটে করে জরিনা। পারলে তোকে তোকে একটা শাড়ি কিনে দেব। খুব দামি শাড়ি। লাল টুকটুকে, রেশমি।

জরিনার সমুখে ক্রীমঙ্গা দেয়ালটা যেন হঠাৎ লাল হয়ে জ্বলে ওঠে– সংগীত হয়ে রিমঝিম করতে থাকে।

এর ঠিক পাঁচদিন পরে আলীজাহ্ বম্বে চলে গেল ছবির কাজ পেয়ে। জরিনার তখন কান্না পেল। তিনদিন ধরে খাতার পৃষ্ঠায় বড় বড় করে চিঠি লিখলো বাঁকা হাতের লেখায়। তারপর কখন যে সেই পৃষ্ঠাগুলো অনাদরে অযত্নে কোথায় পড়ে রইলে তা জরিনা নিজেও জানতে পেল না।

.

শাহ সাদেক আলী জরিনার কামরার কাছে এলেন। এসে দেখলেন দরোজা বন্ধ। ভেতরে রেডিওগ্রামের ভল্যুমটা এত ওপরে ওঠানো যে ডাকলে তার স্বর গিয়ে পৌঁছুবে কী না সন্দেহ।

মেয়েটি তার এমনি, মনে মনে ভাবলেন তিনি, বিব্রত হয়ে, খানিকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে। কিছু বোঝা যাবে না, নিশ্চিত করে কিছু বলা যাবে না তবু যেমন বুঝতে

পারলেন তিনি, কোথায় কী একটা ধাক্কা লেগেছে আজ জরিনার মনে যেটা ভুলবার জন্য চলেছে এই আয়োজন।

এমন ছোটখাটো ঘটনা বহু দেখেছেন সাদেক আলী। দেখেছেন জরিনাকে কষ্ট পেতে। দরোজায় করাঘাত করলেন তিনি। কিন্তু সে শব্দ নিজের কানেই শোনা গেল না। আবার তিনি হাত তুললেন। এবারে আরো একটু জোরে। তবু শোনা গেল না। হঠাৎ ভীষণ জোরে আঘাত করলেন দরোজায়। শাহ সাদেক আলীর গৌর মুঠিতে রক্তিমতা ফুটে উঠলো! ব্যথা করল।

তখন দরোজা খুলে জরিনা দেখল বাবাকে।

কী বাবা?

জরিনাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাছেই যেন নিজে লজ্জিত হলেন সাদেক। বললেন, তোর কি শরীর খারাপ করেছে?

নাতো।

জরিনা বাঁ–হাতে চুলের প্রান্তভাগ সামলাতে সামলাতে উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল তার দিকে। বলল, কিছু বলবে?

রোকসানা ভল্যুম কমাতে বলেছে, কথাটা বলতে সাদেকের কুণ্ঠাবোধ হলো। পরে হঠাৎ উৎসাহের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন–কেননা তার মনে পড়ে গেছে, আলী লাহোর থেকে আসছে আজ। তার করেছে।

কখন?

সন্ধ্যের প্লেনে। যাবি এয়ারপোর্টে?

বলেই সাদেক আর দাঁড়ালেন না, এমনকি একটু আগে যে মেয়ের সঙ্গে বসে চা খাবেন সিদ্ধান্ত করেছিলেন, সেটাও ভুলে গেলেন বলতে।

জরিনা ফিরে এলো ঘরের মাঝখানে। এক মুহূর্ত তার শ্রুতি বধির হয়ে রইলো–কোনো সঙ্গীত সেখানে তুলতে পারল না তরঙ্গ।

আলীচাচা আসছেন।

যেন পৃথিবীর একটা পরম আশ্চর্য সংবাদ শুনেছে সে। ঠিক তার জীবনের এইসব মুহূর্তগুলোতেই আলীচাচার মুখ কেন এমনি করে ভেসে উঠবে? আজ সে ভাবছিল কার কথা? আলী চাচার কথা। আজ তার একটু আগেই না মনে হচ্ছিল তার এই আপনতম লোকটার কথা? যার সহানুভূতির অমৃত আঁজলা ভরে সে পান করতে পারে।

জীবনের যে সমস্ত দুঃসময়ে তার মনে হয়েছে নিচে মাটি নেই আর সমুখের দিগন্ত গাঢ় অন্ধকার তখন মরে যাবার কথা মনে হয়নি। মনে হয়েছে তার শৈশবের কথা, কৈশোরের কথা, মায়ের চ্যাপ্টা কাঠপুতুলের মুখ আর আলীজাহ্ কথা। আলীজাহ্ বলেছে, একমাত্র হৃদয়কে যা স্পর্শ করে তাই-ই সত্য। হৃদয়কে তখন স্পর্শ করতে অতীতের মুখগুলো যা সত্য; হৃদয়কে তখন স্পর্শ করতে নিজের মনোবল যা সত্য; হৃদয়কে তখন স্পর্শ করতে পৃথিবীর অফুরন্ত ব্যঙ্গ—যা সত্য, কিন্তু তেতো।

একবার শুধু তার মনে হয়েছিল আলীচাচার কথা মিথ্যে, যেদিন ঐ ঘটনাটা ঘটেছিল। কলকাতা থেকে ঢাকা আসছিল ওরা তখন। রেলে গিজগিজ ভিড়। আপার ক্লাশ আর লোয়ার ক্লাশে কোনো তফাৎ নেই তখন। টিকিট একটা থাকলেই হলো। তারপর যে কোনো ক্লাশে ওঠা; গাড়ি পাকিস্তানে যাবে।

ট্রেন ছুটে চলেছে অন্ধকার ভেদ করে। আলীজাহ্ সাদেককে কলকাতা থেকে ভালো জায়গা করে তুলে দিয়েছিলো। বাঙ্ক রিজার্ভ করা ছিল তার জন্য-একটা ব্রাঙ্কে তিনজন যাত্রী, তবু সুবিধে। আর শেষ অবধি হুটোপুটির ভেতরে, বুক কাঁপানো গাড়ির ঘণ্টার শব্দের ভেতরে, টালমাটাল পায়ে অন্ধের মতো নূরুন্নাহার আর জরিনা গিয়ে উঠেছে তৃতীয় শ্রেণীর মহিলা কামরায়।

কামরার ভেতরটা যেন লালচে আলোয় বিভৎস হয়ে উঠেছে আরো। একে মানুষ, ট্রাঙ্ক, তৈজসপত্র, বাচ্চা-কাচ্চা-তার ওপরে ভ্যাপসা গরম। বাচ্চাদের চিৎকারে থেকে থেকে

বুকের ভেতরে ছাৎ করে ওঠে, যে এখনি মরে যাবে কেউ। এরি ভেতরে বিলাপ করছে কেউ, কী জিনিস–পত্র আগলে আছে রক্তচোখে।

বুকের ভেতরে ভয় ভয় করছিল দুবোনের। জনারি মনে হচ্ছিল যেন সৃষ্টির আদি থেকে সে এখানে গাড়ির ভেতরে জন্ম নিয়ে এতটা বয়স অবধি পার হয়ে এসেছে। মনে হচ্ছিল, এই বর্তমানই সত্য, বর্তমানেই সব। আর পেছনে যে অতীত, সমুখে যে ভবিষ্যৎ দুইই কোনদিন ছিল না, থাকবে না।

তাই তীব্র করে সে অনুভব করতে পারছিল বর্তমানের প্রতিটি তরঙ্গ।

নূরুন্নাহার অনেকক্ষণ জেগে থেকে থেকে এককোণে ঢুলতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু ঘুম নেই জরিনার চোখে। যেন ঘুম বলে কোনদিন কিছু তার জানা ছিল না।

একটা করে স্টেশন আসে আর মৃদু গুঞ্জন ওঠে ট্রেনে ওঠে আরো নতুন যাত্রী। জায়গা নেই, তাতে কী!

একটা রাতের মত ট্রেনের কষ্ট সইতে পারেন না আপনারা?–জানালা দিয়ে গলা ঢুকিয়ে স্বেচ্ছাসেবকরা অনুনয় করে। আপনাদেরই মা বোন যাচ্ছেন, আপনারা একটু কষ্ট করুন, পাকিস্তান আসবার আর বাকি নেই।

আর বাকি নেই? আর কত দূর?

আবার ট্রেন চলতে থাকে।

তখন রাত দুপুর। কী একটা স্টেশনে গাড়ি থেমেছে। কচি একটা বউ উঠলো তাদের কামরায়– ভীত, সন্ত্রস্ত। সঙ্গে তার ততোধিক ভীত, সন্ত্রস্ত স্বামী। আর একজন বুড়ি–মা হবেন হয়তো।

স্বামীটি নেমে গেল। বুড়ি বসে পড়ল মেঝেয়। আর বউটা ডাগর চোখ মেলে ভয়ে ভয়ে তাকালো। তখন জরিনার চোখ পড়ল তার দিকে। কী সুন্দর তার চোখ; মনে হলো জরিনার, অমন একজোড়া চোখ থাকলে কিছু দরকার নেই আর। শুধু চোখ দিয়েই দেয়া যায়, নেয়া যায়, ভরে ওঠা যায়।

নিজের মুখের জন্য আপশোষের অন্ত ছিল না জরিনার। বসে বসে খুঁত বের করা ছিল তার কৈশোরের একটা সময় কাটানোর উপায়। মনে মনে গাল দিত খোদাকে, যিনি তাকে নিখুঁত চেহারা দেন নি, যিনি কপালটাকে অহেতুক চওড়া করে দিয়েছেন, চোখ যথেষ্ট টানা করে। দেন নি, আর চিবুকের নিচে যথেষ্ট জায়গা ছেড়ে না দিয়েই শেষ করে দিয়েছেন, তাই সুন্দর মুখ চোখে পড়লে, জরিনা চিরকাল তার জন্য বুকের ভেতরে টান অনুভব করেছে।

জরিনা বউটিকে ডেকে নিল কাছে। বসবার জায়গা নেই। কোলের কাছে বসালো তাকে। নিজের অসুবিধে হলো, কিন্তু ভালো লাগল। শুধালো, পাকিস্তান যাবেন?

বউটা তার দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাৎ করলো। মুখে কিছু বলল না। তারপর বউটা জানালার ওপর মুখ রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

গাড়ি ছেড়ে দিল। গতি কেবল এসেছে কী আসে নি, প্লাটফরম তখনো পেরিয়ে যায়নি, আজো স্পষ্ট মনে আছে জরিনার তখন বাইরে অন্ধকারের ভেতর এক ঝলক উষ্ণ তরল কী এসে ছিটকে পড়ল তাদেরই কামরায় তারই জানালা দিয়ে। বউটার চোখে মুখে জরিনার পিঠে এসে পড়েছে। চমকে জরিনা তাকিয়েছে জানালার দিকে। আর বউটা আকস্মিক রকমে চিৎকার করে উঠেছে যন্ত্রণায়, আর্তনাদে খানখান করে ফেলেছে দুধারের বয়ে যাওয়া। হুহু বাতাস।

ইস্, সে কী বীভৎস দৃশ্য! আজো মনে করলে জরিনার হাড় বরফ হয়ে আসে। কয়েক মুহূর্ত কী করে কেটেছে কিছু মনে নেই তার।

পরের ছবিটা যা মনে পড়ে তা হচ্ছে জরিনা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আর বউটা দুহাতে দুচোখ ধরে কাটা মুরগির মতো দাপাচ্ছে মেঝেয়। তার চিৎকারে বধির হয়ে আসছে কান। সেই বুড়িটা ছুটে এসেছে। কাঁদতে কাঁদতে জেগে উঠেছে কোলের বাচ্চারা। বড়রা বিস্ফারিত চোখে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছে। নূরুন্নাহার উঠে দাঁড়িয়েছে।

চুনের গরম পানি ছুঁড়ে মেরেছিল ওরা। এক পলক দেখেছিল জরিনা তিন চারটে নারকী মূর্তি প্লাটফরমে দাঁড়ানো।

বউটা তার ডাগর দুচোখে কোনদিন আর কিছু দেখতে পাবে না। তার স্বামী এসে দেখবে, তার বউ অন্ধ হয়ে গেছে।

চেন টানো, গাড়ি থামাও। সবাই বলেছিল।

পুলিশ ডাকো। আরেকজন বলেছিল।

আর বউটা তখনো চিৎকার করছে।

জরিনা বলেছিল, না, গাড়ি থামবে না। তারপর বউটাকে দুহাতে সোজা করে বসিয়ে বলেছে, আপনারা কেউ পানি আনুন।

পানি এলে পরে ধীরে ধীরে তার মুখ চোখ ধুইয়ে দিয়েছে। এতক্ষণ শান্ত ছিল কী করে সে? কোথা থেকে সে পেয়েছিল এই শক্তি? নূরুন্নাহার, তার মায়ের পেটের বোন, সে পর্যন্ত বিহ্বল; আর সবাই তো এই কেবল সংসার ছেড়ে পৃথিবীতে বেরিয়েছে তারা তো ভয় পাবেই।

তার গা কাটা দিয়ে উঠেছিল তখন। সারাটা পথ সে আগলে বসেছিল বউটাকে।

আজো চুপ করে বসে থাকলে একেক সময় শ্রুতির ভেতরে সেই বউটার বুক ফাটানো যন্ত্রণার কান্না তাকে দোজখে নিয়ে যায়।

আলীচাচার কথা সেদিন মিথ্যে বলে মনে হয়েছিল তার। মনে হয়েছিল এ পৃথিবীতে স্বর্গ হবে না, যে স্বর্গের কথা আবাল্য তাকে শিখিয়েছে আলীচাচা।

অনেকদিন পরে আলীজাহ্‌কে এই ঘটনাটা লিখেছিল জরিনা; আলীজাহ্ তখন লাহোরে। উত্তরে আলীজাহ্ লিখেছিল–তুই একটা বোকা, জরিনা। এ নিয়ে মন খারাপ করবার কী আছে? মানুষ তো পশুই–তাই বলে যারা স্বর্গ সৃষ্টি করতে চায় তারা সে পশুত্বকে দেখে ভয় পাবে কেন? তোর ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। তুই তখন ট্রেন থামাতে বাধা দিয়েছিলি কেন? বাধা দিয়েছিলি এইজন্যে যে, তাহলে পশুদের হাতে নিজেকে তুলে দিতে হতো। একজন যখন পুলিশ ডাকবার পরামর্শ দিয়েছিল, তুই মনে মনে তখন নিশ্চয়ই হেসেছিলি, আমি কল্পনা করতে পারছি। কেননা কী হবে শক্তি ডেকে? শক্তি চিরকালই দুর্বল। শক্তি দিয়ে পৃথিবীর বিহিত করা গেলে, মানুষ আত্মার সাধনা না করে কাঁচা শক্তির সাধনা করত যে।

যে মানুষগুলো চুনের পানি ছুঁড়ে মেরেছিল, ওদের আসনে বসিয়ে বিগ্রহ ছুঁইয়ে সত্যি কথা বলতে বল– দেখবি ওরা যা করেছে তাতে অন্তরের সায় ছিল না। তবে কেন করেছে? কেননা পৃথিবীর প্রায় সব মানুষই অন্তরের সায় না নিয়েই কাজ করে। যদি মানুষ একবার ভাবতে পারত তার অন্তরকে কী স্পর্শ করছে, আর কী করছে না, যদি

মানুষ সেই ভাবে বাঁচতে পারত, তাহলে এত অন্যায় অসঙ্গতি সব ইতিহাসের পাতাতেই বন্দি থাকত, বর্তমানে এসে বর্ধিত হতো না, ভিড় জমাতো না।

বউটার চোখ অন্ধ হয়ে যাওয়াকে আমি প্রতীক হিসেবে নিলাম। তুইও তাই নে। মনে কর, দীপ্তি থাকে না বলেই তো দীপ্তির সন্ধান চলছে আমাদের।

আজ এই বৃষ্টির মুহূর্তে নতুন করে তার মনে হলো, আমি তো আলো আমার মুখে নেবার সাধনা করে চলেছি, আমি কেন কাঁদবো? মানুষের নিচতা দেখে হাত–পা সেঁদিয়ে আসবে কেন আমার?

মনে মনে এত মনে পড়ছিল আলীজাহ্ কথা। তাই বাবার মুখে আলীজাহ্ আসবার খবর পেয়ে সে কী উল্লাস হলো তার। সে সান্ত্বনার হাত যে এমনি অপ্রত্যাশিত এগিয়ে আসবে তা কে ভাবতে পেরেছিল? দুপুর থেকে তো, এই কথাই ভাবছিল সে–আজ যদি আলীচাচা থাকত ঢাকায়।

ভাববার কারণ ছিল বৈকি?

জরিনা উঠে কাপড় বদলালো, চুল বাঁধলো দ্রুত দুহাত। তারপর বাইরে বেরুবার জন্য চটি পরল যে চটি বৃষ্টি ভেজা রাস্তা থেকে কাদা তুলে মাখিয়ে দেবে না।

তাকে বেরুতে দেখে অবাক হলেন শাহ সাদেক আলী।

রোকসানা বলল, ওকে গিয়ে বলেছিলেন কী? রাগ করে বেরিয়ে গেল নাতো।

রোকসানার ভয় হলো বুঝি সাদেক তাকে গিয়ে বলেছে রেডিওগ্রামের ভল্যুম কমাতে তারই নাম করে। নইলে জরিনা একবারও তাকাল না কেন ফিরে?

সাদেক মৃদু হেসে বললেন, ঐ বয়সে আমরাও অমন করতাম না কি? আমি অত অবুঝ নই যে গিয়ে তোমার নাম করবো।–আমাকে আর একটু চা দাও।

বলতে বলতে সাদেক টেনে নিলেন সদ্য লেখা বিবৃতিটা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে লাগলেন। চোখের সমুখে যে জলজ্যান্ত একটা মানুষ বসে আছে এবং মানুষটা যে তাঁরই স্ত্রী একথা যেন তিনি সম্পূর্ণ বিস্মিত হয়ে গেছেন।

রোকসানা তাঁর কাপে চা ঢেলে দিয়ে পেয়ালাটাকে সমুখে রেখে তখন উঠে গেলো। উঠে গিয়ে শোবার ঘরে বসলো। বসে বসে ভাবতে লাগল নতুন বাড়ির কথা। তার সারা জীবনের স্বপ্ন নিজের একটা বাড়ি। বাড়িটা শেষ অবধি হলো তাহলে। আর কদিন পরে। যখন তারা গিয়ে উঠবে তখন–সেই তখনের স্বপ্ন লাগল রোকসানার চোখে মুখে।

পথে তো বেরুলো, কিন্তু যাবে কোথায়? বৃষ্টির পর সারাটা পথ কেমন বিশ্রী হয়ে আছে। কিন্তু আকাশ দেখাচ্ছে অপরূপ — ধোওয়া ধোওয়া, স্বচ্ছ, ভালো। আকাশে অমন সুন্দর

রঙটা যেন খোদা এইমাত্র সৃষ্টি করলেন– এমনটি কোনদিন ছিল না, কোনদিন আর আসবে না।

হাসলো জরিনা, মনে মনে। পথটাকে পায়ের নিচে খুব কাছে করে দেখতে পারছি বলেই বিশ্রীটুকু চোখে পড়ছে। আর আকাশটা অনেক দূরে বলে তার ভালোটুকুই চোখে লেগেছে। যদি আকাশে গিয়ে দৃষ্টি করতে পারা যেত এই পথটাকে তাহলে ভালো লাগত তখন –মনে হতো, রেশমি ফিতের মতো পথটা পড়ে আছে শহরের ভেতরে।

মাসুদের আজকের ব্যবহারটা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি নিষ্ঠুর। নিজের ওপর আক্রোশ হতে থাকে জরিনার–কেন একটা মানুষের ওপর এত নির্ভর সে করতে গিয়েছিল? এতটা নির্ভর করেছিল বলেই তো আজ পতন এত বিষম হয়ে বেজে উঠেছে।

কতকাল আগের কথা সব। এত আগের যে আরেক জনের, আরেক জীবনের গল্প বলে সব মনে হচ্ছে।

.

কর্ণফুলীর পাড়ে তখন কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক হচ্ছে, নদী বাঁধ দেয়া হচ্ছে, রাস্তা হচ্ছে। কাগজ তৈরির কারখানা। কাজ চলছে দিনরাত। ডাইনামো আর অন্যান্য যন্ত্রের অবিরাম কানে তালা লাগানো। শব্দে নিথর নীরব অরণ্য, নদী মুখরিত, শিহরিত।

নূরুন্নাহার আর হামিদুর রহমানের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল জরিনা। আসলে ছুটিতে এসেছিল চাটগা। দুলাভাই বললেন, চলে। কোথাও পিকনিক করে আসি।

প্রস্তাবটা ভালো লেগেছিল জরিনার। যেখানে কিছুই ছিল না, সেখানে রক্ত মাংসের মানুষ পৃথিবীর এবং পৃথিবী ছাড়িয়ে যা কিছু সবার তুলনায় ছোট, অত্যন্ত ছোট একটা প্রাণস্পন্দিত পদার্থ– কী করে জনপদ গড়ে তোলে তা ভেবে রোমাঞ্চের স্বাদ পেয়েছিল তার মন। এইতো মানুষের স্বাক্ষর। মানুষ আছে বলেই তো জগৎ আছে। যদি মানুষ না থাকতো তাহলে কি জগৎ থাকতো? তাই সে রাজ্য গড়ে, দালান ওঠায়, পিরামিড বানায়, গান লেখে। প্রকৃতি যে আজ পৃথিবী দিয়েছে মানুষ তার চেহারা বদলাতে পারে নিজের জন্য, নিজের হাতে–আর কিছু সে নাইবা বদলাতে পারল। আদি সৃষ্টিশক্তি থেকে জাত মানুষ পৃথিবীতে এসেই প্রতিদ্বন্দী হয়ে ওঠে তার উৎসেরই, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বীজই তো জীবন।

জরিনা অবাক হয়ে গিয়েছিল এসে। পা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন তার মনে হচ্ছিল–এ আমি। নিজের দেহ যেন মাটি হয়ে আছে এখানকার, রক্ত যেন ঐ নদী। সকাল থেকে দুপুর, তারপর এক লহমা জিরিয়েই আবার বেরিয়ে সন্ধ্যা অবধি সে ঘুরে ঘুরে দেখেছে। কাজ চলেছে অবিরাম। সেই কাজের প্রতিভা যেন রৌদ্র হয়ে দিনমান জ্বলছে পৃথিবীতে! ভীষণ আনন্দ হচ্ছিল জরিনার। অকারণ, বাধন না মানা, বুঝতে না পারা আনন্দ –যে আনন্দ শুধু আনন্দেই বাঁধা থাকে না, অব্যক্ত বেদনা হয়ে গলার কাছে, বুকের ভেতরে সারাটা শরীরের ভেতরে থরথর করে কাঁপতে থাকে।

রাতে বসে বসে এক শিট কাগজ চেয়ে নিয়ে এইসব কথা লেখা চলছিল নামহীন কোনো পাঠকের জন্য। যদি উৎসাহ থাকে, তাহলে ঢাকা ফিরে গিয়ে আলীজাহ্‌কে পাঠানো যাবে। আর যদি ভুলে যায়, তাহলে জরিনার আরো অনেক লেখার মতো এটাও অযত্নে কোথাও পড়ে থেকে থেকে বিবর্ণ হয়ে যাবে একদিন।

এটা তার একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে; এই, নিজের মনে যে তরঙ্গ উঠল তা না লিখে কিছুতেই স্বস্তি না পাওয়া; বিচার করে, বিশ্লেষণ করে, সব তল থেকে দেখে দেখে একটা ভাবাকে লিখবে, তবেই স্বস্তি। লিতে লিখতে শাসন থাকে না আর নিজের ওপর। বেদনা আর আনন্দ বা ঘৃণা, তা সে যে অনুভবই হোক না কেন, যতক্ষণ না নিঃশেষে শেষ বিন্দুটিও নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে শাদা কাগজে ততক্ষণ ভার য়ে থাক মাথাটা। মাঝে মাঝে বকুনি দিয়ে আলীজাহ্‌ চিঠি লেখে. যাহ, তোর কিছু হবে, এত সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছিস তুই দিন দিন। আমি তোকে শাস্তি দেব ভাবছি। খুব কড়া একটা শাসন।

তখন উত্তরে জরিনা লেখে –শাসন করতে হবে না তোমার। তোমার কাছে লিখি বলেই কি মনে কর সবার সঙ্গে সব কিছুতেই ফিনিক দিয়ে আমার সেন্টিমেন্ট ছুটেছে? তুমি বুঝি জানো না আলী চাচা, সেন্টিমেন্ট থাকবেই, আর ওকে বের করে দেয়ার জন্য কিছু না কিছু করা চাই। সেবার তুমি আমার একগাদা লেখা খে হো হো করে হেসেছিলে। ওগুলো যে আমার কী উপকার করেছে তা যদি তুমি জানতে? আমার মনের ময়লা ধরে রেখেছে ওরা। তাইতো এত মায়া লাগে, না পারি ছিঁড়ে ফেলতে, না পারি প্রকাশ করতে। ভালো কথা, তুমি বলেছিলে না আমি সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছি? দোহাই তোমার একবার ঢাকায় এসে এই কথাটা ছেলেগুলোকে জানিয়ে দাও দিকি। ওরা আমাকে যেন

চিড়িয়াখানার জন্তু পেয়েছে। বলে কিনা– পাথর মেয়ে। ইশারা করলে নাচি না, ইনিয়ে বিনিয়ে চলতে পারি না, কথায় কথায় নিজের নারীত্বকে জাহির করি না–যা আর দশটা মেয়ে করে থাকে, এই হচ্ছে আমার অপরাধ। ভাবি, এমন নারীত্ব–বর্জিত মেয়েকে নিয়ে তোমাদের এই সমাজ চলবে কী করে? নাকি চিরকাল আমাকে তোমাদের অঙ্গনের বাইরেই থাকতে হবে?

আলীজাহ্ তখন লেখে– কোন অঙ্গনের কথা বলছিস, রিনু? ওখানে যে তোকে যেতে হবে না, ওরা যে তোকে ডেকে নেবে– এটা কত বড় সৌভাগ্য তোর, তা আরো বড় হলে বুঝতে পারবি। যাসনে কারুর কাছে। একেকটা মানুষ থাকে অমনি। জন্ম থেকে একা–একেলা। তাদের সঙ্গে কারুর মিল হয় না।

.

ওরা এক বন্ধুর বাসায় উঠেছিল। দুলাভাইয়ের বন্ধু স্থানীয় স্কুলের হেড মাস্টার। দুলাভাই এসে বললেন, কী লেখা চলছে এত? এখানে এসেও মাথা কিলবিল করছে বুঝি?

হ্যাঁ করছে। কপট ক্রোধে জরিনা বলে, করছে না? একটু পরেই উঠে গিয়ে ক্যানাস্তারা বাজাবো ভাবছি। কেমন হয় বলো তো?

বাহ চমৎকার। গ্রাণ্ড আইডিয়া।

পরদিন দুপুরের কথা। ওলটানো মাটি রোদে তেতে রুখু হয়ে আছে। ভারী চাকায় গুড়ো হয়ে ধুলো হয়েছে খুব। একটু বাতাস পেলেই ঝড়ের মতো উড়তে থাকে।

জরিনা, নূরুন্নাহার, দুলাভাই আর হেড মাস্টার ভদ্রলোকটি বেরিয়েছেন দেখতে। তারা যখন হ্যাঁ করে একটা বিরাট বরগা ওঠানোর রোমাঞ্চ অনুভব করছিলেন তখন জরিনা আপনমনে। এদিক ওদিক দেখতে সরে এসেছে অনেক দূর।

আবার সেই বেদনার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আনন্দ আসছে।

হঠাৎ কৌতূহলী চোখ পড়ে একটা মানুষের ওপর। শার্ট, ট্রাউজার পরা ধবধবে, কড়া ইস্ত্রি করা, চোখে চশমা। ধুলোর ওপর চার হাত পায়ে উবু হয়ে কী যেন দেখছে।

কাছে গিয়ে তাকিয়ে দ্যাখে, আঁকিবুকি কাটা বিরাট একটা কাগজের ওপর পেন্সিলের ডগা দিয়ে কী যেন খুঁজে চলেছে ভদ্রলোক আপন মনে। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তার পায়ের ধাক্কায় মিহি এক পশলা ধুলো বৃষ্টি হয়ে গেল সেই নকশার ওপর, তাতে হঠাৎ করে অপ্রস্তুত হলো জরিনা, কিন্তু লোকটার তা নজরেই পড়ল না। জরিনা ভাবলো সরে যায় সেখান থকে। ছি, ছি, কী বিশ্রী ব্যাপার। পায়ের ধুলো মাখিয়ে দিল তার কাজের কাগজে!

কিন্তু তার আগেই লোকটা বলল ঠিক তেমনি আত্মসমাহিত ভাবে নকশার দিকে চোখ রেখে খুঁজতে খুঁজতে, দাঁড়ান, দাঁড়ান একটু।

জরিনা অবাক হলো। কী বলছেন তিনি!

একটু পরে লোকটার পেন্সিল একটা রেখা ধরে নেমে এসে থেমে গেল দ্রুত। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল হঠাৎ। ঝাঁকুনি দিয়ে চোখ তুলতে তুলতে বলল, এতক্ষণে বুঝেছি এটা যাবে এদিকে দিয়ে আপনি!

জরিনার দিকে চোখ পড়তেই আমতা আমতা করে থেমে গেল সে। তারপর উঠে দাঁড়াল দুহাত ঝাড়তে ঝাড়তে। বলল, মাফ করবেন। বুঝতে পারিনি। কন্ট্রাকশনের লোক মনে করেছিলাম। বেড়াতে এসেছেন বুঝি?

হ্যাঁ।

আমরা গড়ি, আপনারা দেখেন। গড়বার বিনিময়ে এটাও একটা পাওনা। ফাউ বলতে পারেন। লোকটা হাসে। বলে, এইতো দেখুন না, গড়ে চলেছি আমরা। শেষ হলে কোথায় যাবো, আবার কী গড়তে হবে কিছুই জানি না। দশ বছর বাদে এখানে এলে, আমাদের কেউ চিনতেই পারবে না, জানবেও না।

জরিনার ভালো লাগল লোকটার কথার ধরন। আর তার কণ্ঠ কী মুক্ত–খোলা আকাশের নিচে, এলোপাথারি ছড়ানো মানুষ আর যন্ত্রপাতির ভিড়ে এমন কণ্ঠই যেন মানায়। বল, আপনি নিজের দিকটা বড্ড বেশি করে দেখেন, তাই না?

কী জানি। কোনকালে তো নিজের দিকে তাকিয়ে দেখিনি। আপনি বলবার পর মনে হচ্ছে হয়ত হতেও পারে।

আপনি এঞ্জিনিয়ার?

নাহ। সলজ্জ হেসে বলেছিল লোকটা, ফিল্মে কাজ করি, ব্যাস।

পরে অবশ্যি জেনেছিল যে মাসুদ শুধু এঞ্জিনিয়ারই নয়, আমেরিকা থেকে একটা বড় ডিগ্রিও এনেছে।

সেদিন মাসুদ তাকে সমস্ত এলাকাটা ঘুরিয়ে দেখিয়েছে।

আসবার সময় মনে হয়েছিল জরিনার, আসাটা খুব সহজ হচ্ছে না। মাসুদও কেমন বিব্রত বোধ করছিলো তখন। বলেছিল, কদিন থাকবেন?

কাল পরশু, ঠিক নেই।

আপনাদের এখানে ভালো না লাগারই কথা। কী আছে এখানে? বলে অসহায় চোখে তাকিয়েছিল মাসুদ, আর দুহাতের আঙ্গুলগুলো সবল একজোড়ে গ্রিপের মতো নাড়ছিল।

ভাবটা যেন এমন কিছু এখনি বানিয়ে ফেলা যায় না, যা জরিনাকে আর কটা দিন এখানে ধরে রাখতে পারবে?

জরিনা যেন তার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল। তাই সে বলেছিল, আপনারা হলেন এ কালের আলাদিন। আমরা আলাদিনদের কাণ্ডকারখানা দেখার জন্যে এখনো এক পায়ে খাড়া। ভালো লাগবে না কেন? বেশ লাগছে? ঢাকা যেতে হবে কিনা, তাই যাচ্ছি।

মাসুদ তখন বলেছিল, দেখলেন তো, একটু আগে বলছিলাম না, আমাদের কথা কেউ মনেও রাখে না। নইলে আমার মতো কম কারখানা গড়া মানুষ এসেছে পৃথিবীতে? অথচ একজনের নামও জানেন না। আলাদিন বলেই বুঝিয়ে দিলেন। বড় ভালো লাগলো আপনাকে দেখিয়ে শুনিয়ে। তৃপ্তি পেলাম সত্যি। নির্লজ্জের মত শোনাচ্ছে হয়ত।

না, একটুও না।

তাহলে আরো একট নির্লজ্জ হতে বাধা নেই, কী এলেন? আসুন, আমার লাঞ্চ শেয়ার করি। কেমন?

থাক, থাক। লোভ দেখাতে নেই।

কীসের লোভ?

বিস্ময়ে, বোধহয় কিছুটা ভয়ে, মাসুদ শুধিয়েছিল।

মুখ গোল করে জরিনা উত্তর দিয়েছিল, খা–বা–র।

ওহো। তবু ভালো। যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।

হেসে উঠলো জরিনা। বলল, তারচে এক কাজ করুন। সন্ধ্যের সময় দ্র হয়ে আসুন, মানে ধুলো কালি মুছে, হেডমাস্টার সাহেবের বাড়িতে। আজ রাতটা আমাদের সঙ্গেই খাবেন। নিজে কিছু গড়ার সামর্থ নেই, ইচ্ছে–এতদিনে ইচ্ছেটাও বোধহয় মরে গেছে। আপনার সঙ্গে কথা বলে দেখি সেটাকে বাঁচিয়ে তোলা যায় কি না।

সেদিন সন্ধ্যের সময় সত্যি সত্যি মাসুদ ধুলোকালি ঝেড়ে ফিনফিনে পাঞ্জাবি চাপিয়ে এসেছিল। ভীষণ সৌখিন কিন্তু কোথাও বাড়াবাড়ি নেই –দেখে এমনি একটা মন্তব্য করা চলে।

এসেই বলেছে, আপনার কথামতো নিজেকে যথাসম্ভব ভদ্রলোক করে হাজির করলাম। এখন বলুন, কত নম্বর দিলেন ফুলমার্কের ভেতর?

ফেল! ডাহা ফেল করেছেন।

জরিনা তাকে নিয়ে বসালো ওধারের প্রশস্ত বারান্দায়, যেখানে দূরের কনস্ট্রাকশন ক্যাম্পগুলো চোখে পড়ে। সন্ধ্যে হয়েছে। বিন্দু বিন্দু আলোয় নতুন বউয়ের চন্দন চর্চিত মুখশ্রীর মতো হয়ে উঠেছে আকাশ মাটি মেলানো অন্ধকার। সেদিকে তাকিয়ে চুপ করে ছিলো মাসুদ।

কী ভাবছেন?

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া জরিনার মুখের দিকে তাকিয়ে মাসুদ ম্লান হাসলো। বলল, না কিছু না।

ভাবছেন না? কেন মিথ্যে কথা বলছেন?

খুব অস্পষ্ট, প্রায় শোনা যায় না, এমনি করে তখন মাসুদ উত্তর করল, মানুষ চুপ করে থাকে ভাবনা কিছু না থাকলেও। আমাকে খুব কি ভাবিত দেখাচ্ছিল?

হ্যাঁ ভাবছিলেন। হয়ত ভাবছিলেন, গড়ে ওঠার পর যে চেহারা হবে এই মাটির, তাই।

খুব সম্ভব, তাই। একেকদিন রাতে স্বপ্নেও দেখি। দেখি– লক্ষ লক্ষ মানুষের বসতিতে আলো হয়ে উঠেছে কর্ণফুলীর দুই তীর। বলছিলেন না গড়ার ইচ্ছে আপনারও, কিন্তু সামর্থ নেই। কী গড়তে চেয়েছিলেন?

জরিনা ঘাড় কাৎ করে আনমনে টেবিলে পানির গ্লাশটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে ভাবল খানিক। ততক্ষণ মাসুদ নিবিড় একমুঠো অধীরতা হয়ে অপেক্ষা করল তার উত্তরের জন্য। কিছুক্ষণ পরে ভাবনা রেখে জরিনা বলল, না কিছুই না। কিছু মনে করতে পারছি না।

সে কেমন কথা? নিজেই জানেন না?

না। নাতো। ভেবে দেখিনি। তারপরে হঠাৎ জোর পেয়ে গেল যেন সে, বলল, ইচ্ছেটাই বা কজনের থাকে?

সত্যি কথা। আমি নিজে, জানেন, বড় ইন্সপায়ার্ড মানুষ। মা বলেন, এটা আমার একটা ম্যানিয়া। আমি তো বলি–ইচ্ছেটাই নেই এখন আমাদের। নইলে প্রতিভা আছে, বুদ্ধি আছে, হাত আছে, চোখ আছে, কাদামাটি আছে, অথচ মূর্তি গড়তে পারি না কেন? বদলে কাদামাটি দিয়ে কেবল ছোঁড়াছুড়ি করি।

কথাটা ভাল লাগল জরিনার। কোনো আত্মম্ভরিতা নেই, চটক নেই, প্যাঁচ নেই–একেবারে অন্তর থেকে উঠে এসেছে যেন। কতদিন সে এমন মানুষ দেখেনি যে ঠোঁট দিয়ে কথা বলে না, অন্তর দিয়ে বলে।

কোথায় যেন বাবার সঙ্গে, আলীজাহ্ সঙ্গে মিল আছে মাসুদের। জরিনার এটা আরেকটা স্বভাব–পৃথিবীর সব মানুষকে সে যেন সহজ দুটো ভাগে ভাগ করে ফেলেছে। বাবা ও

আলীজাহ্ মতো কিংবা বাবা ও আলীজাহ্ মতো নয়। আলীজাহ্ বলতো–তোর নিজের মতো কাউকে খুঁজে নে। বলতো–অবশ্যি খুঁজে পেলেই যে তুই বেঁচে গেলি তা নয়; একটা মানুষ আরেকটা মানুষের কিছু করতে পারে না, তা সে যতই মিল থাক; শুধু সহানুভূতি দিতে পারে–তা সেটাই বা কম কীসে?

জরিনার মনে হলো এই মানুষটার সহানুভূতি যেন সে আশা করতে পারে। খুব স্পষ্ট করে মনে হওয়া নয় এটা। কেবল একটা ইশারা মাত্র।

মাসুদ একটু পর বলল, গড়তে আপনিও জানেন, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি।

কী?

কেন, এই যে সন্ধ্যেটা। এমন সন্ধে। তো জীবনে প্রত্যেকটা দিনই হচ্ছে। কিন্তু আজকের সন্ধ্যেটার বিশেষত্ব আছে। এটা আপনার হাতে গড়া।

একটুও না। কী এমন?

এমনটি কোনদিন ছিল না, কোনদিন হবেও না। তাছাড়া আরো আছে।

আর কী?

জরিনার মৃদু হাসিটা এবারে কেমন বিব্রত দেখালো। তখন মাসুদ ইশারা করলো টেবিলে রাখা বাতিগুলোর দিকে।

এগুলো।

ওহ্। এতো ছেলেখেলা। কাজ ছিল না তাই।

তা বাতিগুলো যে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করত বৈকি। বারান্দায় গোটা তিনেক ব্রাউন কাগজের ঠোঙ্গা পড়েছিল। জরিনা সেগুলো তুলে নিয়ে তলা সমান করে বসিয়েছে–ভেতরে ইঞ্চি খানেক ভরে দিয়েছে শুকনো মাটি দিয়ে আর মুড়ে দিয়েছে রিবনের মতো করে খোলা মুখের চারধার। তারপর সেই মাটিতে মোম জ্বালিয়ে বসিয়ে দিয়েছে।

সেই বাতি একটা ছিল টেবিলে; আর দুটো বারান্দার রেলিংয়ে। অনেকটা আকাশ-প্রদীপের মতো হয়েছে দেখতে। স্পষ্ট কোনো আলো হচ্ছে না, তীক্ষ্ণ কোনো ছায়া পড়েনি। যেন এককোণে একটি স্বর্গ সৃষ্টি হয়েছে।

এটা কোনো পরিকল্পনা করে করা নয়। মনে হয়েছে, তাই করেছে। কিন্তু মাসুদ সেটা উল্লেখ করবার পর তার মনে হলো –ও ভাবছে আমি ইচ্ছে করে করেছি। ওর জন্য করেছি।

নিজের ওপরে নিজেই মনে মনে চটে গেল জরিনা। যদি করেই থাকি তাতে কিইবা এমন ক্ষতি হয়েছে। একটা মানুষকে স্বাগতম জানানোর জন্য একটু কিছু করাটা কি অপরাধ?

মাসুদ তখন বলছে, বলছিলেন এগুলো ছেলে–খেলা। খেলাচ্ছলে আর কী করেন আপনি?

জরিনা আড়চোখে তাকিয়ে দেখল তাকে। প্রশ্নটার গভীরতা আন্দাজ করবার চেষ্টা করল।

পরে বলল, না, সব বানিয়ে বলেছি। খেলার জন্যে কিছুই করি না আমি। যা ভালো লাগে তা–ই করি। তা নিয়ে ঠাট্টা করছেন কেন?

কই নাতো। ঠাট্টা করিনি তো। আমি ইট কাঠ পাথর লোহা ছাড়া আর কিছু দিয়ে গড়তে জানি না। যারা জানে তাদের হিংসে করি মনে মনে।

তাহলে হিংসে হচ্ছে বলুন।

মাথা দুলিয়ে মাসুদ উত্তর করলে, হ্যাঁ তা বলতে পারেন বৈকি।

গড়তে পারেন, ভাঙতে পারেন না?

জরিনা হঠাৎ শুধোল। শুধিয়ে গভীর দুচোখে প্রায় অন্ধকার মাসুদের দিকে তাকিয়ে থাকল। মাসুদ চোখ তুলে তাকাল তার দিকে। বিস্মিত হল। অপরূপ মন হল তার মুখটাকে। পৃথিবীর অনন্ত জলতল ভেদ করে বিশাল একটা ঝিনুকের মতো জরিনার মুখ উঠে এসেছে যেন।

না পারি না। কখনো পারি না।

আমি পারি। দেখবেন।

ফুঁ দিয়ে বাতিগুলো নিভিয়ে দিল জরিনা। তলিয়ে গেল অন্ধকারে। কোথা থেকে ঝিল্লির মতো মিহি একটা আলো তখন ফুটে উঠল তাদের দুজনকে ঘিরে। সেই আলোতে মুখ দেখা চলল না। অনুভব করা গেল।

.

তারপর থেকে এমন হলো, ঢাকা এলেই মাসুদ একবার দেখা করতই জরিনার সঙ্গে।

সেই দেখাটা আস্তে আস্তে ভালবাসার রূপ নিল মাসুদের মনে। আর জরিনা? জরিনা বুঝতে পারত না তার ভেতরে কী হচ্ছে। যা হচ্ছে তার নামই কি ভালোবাসা? এই ভালোবাসার কথাই কি এতদিন বলে এসেছে সবাই বই লিখে, গান গেযে, ছবি এঁকে? এই কি সেই ভালোবাসা যা নূরুন্নাহার অনেকদিন আগে বানান করে শিখিয়েছিল তাকে?

না, না। প্রথম প্রথম জরিনা ভেবেছে–এ হচ্ছে সহানুভূতি, এ হচ্ছে–। আর কোন নাম মনে আসতো না তার। তখন বিব্রত লাগত নিজেকে। তখন কাগজ টেনে পাগলের মতো আবোল তাবোল লিখত আলীজাহ্‌কে। লিখত–তুমি বলোত, এই ব্যাপারটাই কি ভালোবাসা?

আলীজাহ্ খুব স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেনি তার। লিখেছে– ভালোবাসা কি ঐ মেডিক্যাল কলেজে উপুড় করে শোয়ানো কালো হয়ে যাওয়া পিন করে রাখা মরা মানুষের শরীর যে ছুরি কাঁটা দিয়ে কাটা ছেঁড়া করলেই গট গট করে সব বলে দেয়া যাবে?

তা এই অনুভূতির নাম যা কিছুই হোক, মাসুদকে আমার যেমন করে ভালো লাগে, নিজের মনে করতে ইচ্ছে হয়, তেমন আর কাউকে লাগে না, হয় না–জরিনা ভেবেছে। যদি এটাই ভালোবাসা হয় তো, হোক।

ঠিক বাইরের একটা মানুষকে এমনি করে কোনদিন আর নিজের মনে করতে ইচ্ছে করেনি তার। মাসুদ চাটগাঁয়ে থাকবে, কিন্তু সে কেমন থাকবে না থাকবে তা জানবার অধিকার যেন জরিনার আছে। এই ভাবনাটা এত প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল অল্প কিছুদিনের মধ্যে যে, হপ্তায় একটা চিঠি না পেলে ভীষণ রাগ হতো। সেজন্য তক্ষুণি বকাবকি করে লিখতে বসতে না বটে, কিন্তু পরে কখনো উত্তর দিতে বসে কিছুটা ঝাঁজ ছড়াতে কার্পণ্য করতে না। এদিকে ফি হপ্তায় মাসুদের চিঠি চাইই আর নিজে লিখবার বেলায় মাসে দুমাসে একখানা– তাও খুব বেশি হলে আট থেকে বারো লাইন।

মাসুদ ঢাকায় এসে অনুযোগ করলে জরিনা উত্তর করতো, কেন, অনেক তো লিখি। আর কিছু আছে নাকি লেখার?

কথাটা সত্যি নয়। লিখতো সে –অনেক কিছুই লিখতো, যদি না তার জানা থাকত মাসুদ তাকে ভালোবাসে, আর যদি না নিজের ভেতরেও যা হচ্ছে তা ভালোবাসা বলে সন্দেহ করা হত। এই সত্য আর সন্দেহটাই তাকে যেন বারণ করে বেশি লিখতে, বারবার লিখতে। নইলে যে রাশি রাশি কাগজ তার মনের আকুলি বিকুলি নিয়ে কালিমাময় হয়ে ওঠে তা থেকে একমুঠো তুলে পার্সেল করে পাঠাতেও তার এতটুকু দ্বিধা হবার কথা নয়।

এমনি করেই চলছিল। একদিন কে একজন বলল, কিরে তুই নাকি প্রেম করছিস খুব?

কী করছি!

আর্তনাদের মত শোনালো জরিনার কণ্ঠ।

আহা, প্রেম। ওতো সবাই করে। তুই বাইরে ঠাট্টা করিস সবাইকে আর ডুবে ডুবে এত?

মিথ্যে কথা, বাজে কথা। যে বলেছে সে ইতর।

.

এ ঘটনাকে ভুলেই যেত হয়ত। কিন্তু একদিন জরিনা শুনতে পেল, সে নাকি মাসুদকে বিয়ে করবার জন্যে খেপে উঠেছে, মাসুদই তাকে আমল দিচ্ছে না; তবু কি জরিনা ছাড়বে ইত্যাদি ইত্যাদি।

কৈশোর পেরুনো বাচাল একটা ছেলে বা মেয়ের কাছ থেকে শুনলে হয়ত উপেক্ষা করা যেত। কিন্তু যে বলেছে সে রীতিমত প্রৌঢ় এবং দুলাভাই হামিদুর রহমানের বেশ অন্তরঙ্গ মানুষ। কথাটা দুলাভাই মারফৎ শোনা।

সেদিন রাতে সে ভাবতে বসলে কী করে এই কথাটা ছড়িয়ে পড়ল এমনি করে?

ভালোবাসা সম্পর্কে তো নিজেই এখনো সন্দিহান, এখনি বিয়ের কথা উঠল?

ইতিমধ্যে মাসুদের একটা চিঠি এলো। তাতে সে লিখেছে–জানি না, তোমার কানে উঠেছে কিনা, কিন্তু সবাই বলাবলি করছে আমার সঙ্গে তোমাকে জড়িয়ে। তাতে তোমার মনে আঘাত লাগতে পারে ভেবে বড্ড খারাপ লাগছে আমার। ভয় করো না লক্ষ্মীটি। যদি দরকার হয়, আমার বাড়ানো হাত তো রইলোই। আমি তোমাকে ফেলে পালিয়ে যাবো না। কী বল তুমি?

চিঠিটার ভেতর থেকে একটা প্যাচানো উদ্দেশ্য যে ঠেলে ঠেলে ওপরে উঠে আসতে চাইছে। মাসুদ তো কোনদিন এমন ছিল না। যে মাসুদকে সে এতখানি নির্ভরতা আর বিশ্বাস দিয়েছে, যার কাছ থেকে এতকাল সে বিশ্বাস নিয়েছে আর নির্ভরতা খুঁজছে, সে কেন তাকে চাইতে গিয়ে এমন জটিল–কণ্ঠ হয়ে উঠবে? তার এই ভঙ্গিটার সঙ্গে কিছুতেই যেন সে আপোষ করতে পারে না। কেবলি কে যেন ভেতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে চায়।

সেদিনই সে জরুরি ডাকে চিঠি লিখল মাসুদকে, অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতো বেপরোয়া করে–মানুষের কাছে ভালোবাসার গল্প করার সাহস পেলে কী করে? আমাকে তুমি মনে কর, অনেক চিনেছো? অমন মনে করে থাকলে ভুল শুধরে নিও। ভালোবাসার জন্যে এখনো প্রস্তুত নই। তোমার প্রস্তাবটা নিয়ে তাই ভাবতে পারলাম না।

এই চিঠিটার জবাব আসতে অনেক দেরি হয়েছিল। তখন দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে তার, মাসুদই বলেছে সবাইকে এই বিয়ের কথা, ভালোবাসার কথা। যে কথা সরাসরি বলতে তার বেধেছে, সেই কথা সে লোকের মুখ দিয়ে তাকে শুনিয়েছে।

জরিনার এমন মনে হয়, প্রথমদিন যে মানুষকে সে দেখেছিল, আর আজকের যে মাসুদ তারা সম্পূর্ণ আলাদা দুজন।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

একে তো জরিনা মাসুদকে লিখত কম, এরপরে লেখাটা যেন প্রায় শূন্যে এসে দাঁড়াল। শুধু তাকেই নয়, আলীজাকেও। মাসুদ অতিষ্ঠ হয়ে একের পর এক চিঠিতে লিখত–কী হয়েছে তোমার? একবার কি আসবো?

আলীজাহ্ লিখেছে–সেন্টিমেন্টের আতশগুলো নিঃশেষ পুড়িয়ে ফেলেছিস বুঝি? নইলে তোর পাগলপাগল চিঠিগুলোর কী হলো? নাকি মহাকাব্য লেখার পরিকল্পনায় মগ্ন হয়ে আছিস?

জরিনা লিখেছে–হ্যাঁ আলীচাচা, মহাকাব্য লেখাই চলছে আমার। জীবন–কাব্য। জীবনের কবিতা। জীবনে যে কবিতা নেই সেই কথাটা স্বপ্নচারীর মতো কবিতা করে বলার কথা ভাবছি। অবশ্যি, এ ছাই লেখা হবে না কোনদিন। আমাকে দিয়ে শুধু পরিকল্পনাই চলে, হয়তো আরম্ভ পর্যন্ত, কিন্তু শেষ আর হয় না।

৫. কদিন আগে মাসুদের চিঠি

কদিন আগে মাসুদের চিঠি পেয়েছিল ও ঢাকা আসছে। মনে মনে রোজই অপেক্ষা করছিল কখন মানুষটা এসে পৌঁছুবে। তখন কী হবে, সে সম্পর্কে কিছুই যদিও সে ভাবেনি, তবু বলা চলে বোঝাঁপড়া করার একটা সিদ্ধান্ত সে নিয়েছিল।

নিজের কাছে অত্যন্ত সৎ হলে এমনি নির্মম হয় মানুষ। কিন্তু আবাল্য এই শিক্ষাই তো সে পেয়েছে।

হঠাৎ করে বাইরেই আজ দেখা হয়েছে মাসুদের সঙ্গে। সকালে। রিকশায় উঠছিল, পাশ থেকে সবুজ জীপ থামিয়ে গলা বাড়িয়ে মাসুদ বলল, আমি।

তার দিকে ভালো করে তাকাতে পারল না জরিনা। কিন্তু সেটা এক মুহূর্তের জন্য। পরে খুব সরাসরি তাকিয়ে বলল, তোমার সাথে কথা আছে, এক্ষুণি।

পরে কিন্তু অনুতাপ হয়েছিল খুব–বৃষ্টির সময়ে, নিজের ঘরে। কেন সে অধীর হয়ে উঠেছিল কথা বলবার জন্য? কী দায় পড়েছিল তার? এক মুহূর্তের এই অসতর্কতার দরুণ নিজেকে যেন কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছিল না জরিনা।

মাসুদকে নিয়ে একটা রেস্তারাঁয় গিয়েছিল। জরিনা সরাসরি বলেছিল, কেন তুমি সবাইকে বলতে গেলে এসব? তাছাড়া আমি তো তোমাকে কোনদিন বলিনি যে ভালোবাসি।

তোমাকে আর বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হয় না।

অভিযোগটা মাসুদ শুনছিল চোখ নাবিয়ে, মুখ নাবিয়ে। যেন এমনি করে থাকলে, তাকে স্পর্শ না করেই তার ওপর দিয়ে কথাগুলো পেছনের দেয়ালে চলে যাবে। ভঙ্গিটা দেখে আরো গা জ্বালা করল জরিনার। এবং এককোণে একটু মমতাও কি ছিল না? ছিল হয়ত।

কী, কথা বলছ না যে?

কী বলব?

আমি ঘৃণা করি খুব ঘৃণা করি।

কী?

যারা সত্যি কথা বলতে ভয় পায়।

জানি।

নিশ্চয়ই জানো না। জানলে কেন নিজে থেকে কথা বানালে? তোমাকে বিয়ে করবার কথা উঠালো কে?

মাসুদ তবু কিছু বলল না। জরিনা তখন নিজের সঙ্গে ভীষণ সংগ্রাম করছে। একদিকে, ওকে গলা ধাক্কা দিয়ে পথের ওপরে ফেলে দিতে ইচ্ছে করছে অন্যদিকে ইচ্ছে করছে মমতা দিয়ে ভরিয়ে দিতে। মনে মনে মাসুদকে সে বলল তুমি সাবধানে উত্তর দিও, তোমার কথার ওপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করছে লড়াইয়ে কোন পক্ষ জিতে যাবে; আমার নিজের কোনো হাত নেই।

মাসুদ হঠাৎ চোখ তুলে বলল, হ্যাঁ বলেছি।

তার কণ্ঠে ঔদ্ধত্য মেশানো। হাসি পেল জরিনার। মাথা দোলালো সে। যেন বলতে চাইলো–না, বন্ধু না।

আবারো বলল মাসুদ, বলেছিলাম–একজন দুজনকে।

আর আমিই নাকি পাগল হয়ে আছি? তুমি রাজি হচ্ছি না?

কে বলেছে?

সেইটাই জানতে চাই?

যেন কী একটা ভীষণ জিদ চেপে গেছে জরিনার।

মাসুদ তখন খুব অন্তরঙ্গ কণ্ঠে শুধিয়েছে, আচ্ছা, একটা কথা জিগ্যেস করব?

চোখ দিয়ে নীরবে সম্মতি দিল জরিনা।

আমি বুঝতেই পারছি না, এ নিয়ে এত বিচলিত হবার কী আছে!

কিছু কি নেই?

নিজের কণ্ঠে ব্যঙ্গ শুনতে পায় জরিনা।

কী জানি, তোমার কাছে থাকতে পারে। আমার চোখে পড়ছে না। আমি তোমাকে ভালোবাসা দিয়েছি, এটা সত্যি। বিয়ের কথা যে ভানিনি তাও নয়। সেটা দশজনে জানলে কী এমন হয়?

এই হয়, যে আমার ক্ষতি হয়।

কেন?

বাহ, নিজে যা জানলাম না, বুঝলাম না, তা হঠাৎ করে মানতে যাবো কেন?

তাহলে–

কী তাহলে?

তাহলে, এতদিন কী বলেছো তুমি আমাকে? আমাকে জেনে শুনেও প্রশ্রয় দিলে কেন? ভালো না বাসলে, ফিরিয়ে দিলে না কেন? কে তোমাকে বলেছিল, আমার সবকিছু নিষ্ঠুরের মতো, স্বার্থপরের মতো, নিজের করে নিতে? দিনের পর দিন?

শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠল জরিনা। অতি কষ্টে সামলে নিল নিজেকে। মুখে শুধু বলল, থাক। আমি চলোম।

মাসুদ উঠে দাঁড়িয়ে, তার দাঁড়ানোর আগেই পথ আগলে বলল, নিজের কথাই বলে গেলে, আমারও কিছু বলার থাকতে পারে।

ভাবলো জরিনা। ভেবে সিদ্ধান্ত নিল– যা বলে বলুক। যে মানুষটা কারণে কিংবা অকারণে অসহ্য হয়ে উঠেছে, সে যা খুশি বলুক তাতে তার কিছু এসে যাবে না।

মাসুদ বসলো না। দাঁড়িয়ে থেকেই বলল, আমি সাহিত্যের ছাত্র ছিলাম না, কবিতার বই হাতে নিয়েও দিন কাটে না আমার। ফলিত বিজ্ঞানের সেরা ছাত্র ছিলাম তার মানে,

তোমার কাছে একেবারে রস–বিবর্জিত আঁকজোঁকের মানুষ। আমি এসব কিছু বুঝতে পারি না–তোমার মতো নিজের মনকে চিবিয়ে চিবিয়ে রস নেওয়ার মতো রসনা আমাকে আল্লাহ দেননি।

কী–কী বলতে চান আপনি?

বজ্রপাতের মত শোনাল জরিনার উচ্চারণ –মাসুদের কাছে, এবং তার নিজের কাছেও। মাসুদ বলল, ভালোই হলো। বেশ করলেন। এবারে আপনি যেতে পারেন। তবে যাবার আগে একটা কথার উত্তর দিয়ে যাবেন? কটা প্রেম করেছেন আরো?

বিস্মিত হলো জরিনা মাসুদের অপমান করবার নির্ভেজাল ক্ষমতা দেখে। আর আক্রোশ হলো নিজের ওপর। নিজেকে শাস্তি দেয়ার হিংস্র বন্য একটা ইচ্ছেয় ভেতরটা দুলতে লাগল। বলল, অনেক। হিসাব করলে তা এক ডজন হবে বৈকি। আপনার তো মোটে একটা। লাফ গেম খেয়ে থুতু ছিটোচ্ছেন এখন।

জানতাম। নইলে লোকের রটনাকে এত ভয় করে আপনার? সবার কাছেই মুখোশ খুলবে যে। ধন্যবাদ, আপনার ভ্যানিটি ব্যাগে যে কটা ফুল আছে থাক, আমি আর সংখ্যা বাড়াতে চাই না।

তখন উঠে দাঁড়াল জরিনা। বলল, আর কিছু বলার আছে আপনার?

মাসুদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। জরিনা আবার শুধালো, বলুন যত খুশি সময় চান, দিতে পারি।

তবু মাসুদ কিছু বলল না। তখন জরিনা বেরিয়ে এলো কেবিনের সবুজ পর্দা ঠেলে বাইরে, সেখান থেকে পথে; পথটা ঠিক আগের মতই ব্যস্ত, উদাসীন, চঞ্চল।

সন্ধ্যার পর পরই আলীজাহ্ ঢাকা এসে পৌঁছুলো। ট্যাক্সি থামবার শব্দে রোকসানা বারান্দা থেকে উঁকি দিয়েছিল। দেখতে পেয়ে ফটক অবধি এগিয়ে এসে বলল, কেন, জরিনা এয়ারপোর্টে যায়নি?

না। নাতো।

আলীজাহ্ও একটু বিস্মিত হয়েছে জরিনাকে এয়ারপোর্টে না দেখে। লাহোরে যাবার পর অন্তত ছসাত বার সে এসেছে ঢাকায়। আর প্রত্যেকবারই এয়ারপোর্টে ছোট্ট মেয়েটির মতো জরিনা পায়ের গোড়ালি তুলে, রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়ে, ফুলঝুরির মতো হাসিমুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। তারপর একসঙ্গে ফেরা। ফিরেও কি নিস্তার? সোজা একেবারে জরিনার কামরায় গিয়ে জিরোবে কতক্ষণ, ঝড়ের মতো বলবে, শুনবে, তবে মুক্তি।

এবারে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। ব্যতিক্রমটা চোখে পড়লেও খুব একটা কষ্ট হয়নি আলীজাহ্। কেননা যে ম্লান মন নিয়ে সে আজ ফিরে আসছে ঢাকায় তা যে কোনো

বিচ্যুতি সহ্য করতে পারে। আজ আলীজাহ্ সন্দেহ হচ্ছে, আদৌ তার মন বেঁচে আছে কিনা।

আলীজাহ্ গিয়েছিল লাহোরে। তার আগে প্রায় বছর দুয়েক ঢাকায় থেকেছে। ঢাকায় ফিল্ম স্টুডিও নেই। আলীজাহ্ তাই চেষ্টা করেছে এখানে আপাতত চলচ্চিত্রে না হোক, অন্তত নাট্য আন্দোলন গড়ে তোলা যায় কিনা। একটা নাটক লিখেছিল তখন। এই হঠাৎ জেলা–সদর থেকে বাজধানীতে রূপান্তবিত হয়ে যাওয়া, দ্রুত বেড়ে ওঠা, দ্রুত চেহারা বদলানো জ্বলন্ত, প্রখব অচেনা ঢাকাকে সে রক্তের মতো ব্যবহার করেছিল তার নাটকের জন্য। আর ছিল নতুন মধ্যবিত্তের কয়েকটা মানুষ প্রধান কুশীলব তারা। আলীজাহ্ সন্ধানী নির্মম চোখে নগ্নরূপ ফুটে বেরিয়েছিল এই মধ্যবিত্তেরযারা আসলে জাত মধ্যবিত্ত নয় মোটেই। দেশভাগের প্রবল ধাক্কায় নিচতলা থেকে উঠে এসেছে একদল, আরেকদল সীমান্তের ওপারে সব ফেলে এসে নিচে নেবে গেছে। দুরে যে মিলন–মঞ্চ সেটাই তো আজকের মধ্যবিত্তের পনেরো আনা। তাই মেজাজ পায়নি পুরোপুরি কেউই–মিশেল হয়নি–মানুষের চেতনা তো সজীব, তাই নেবুলার মতো অন্তস্থলে প্রবল ধর্ণমান সংঘর্ষ চলেছে। কে জানে কোন নক্ষত্র, কোন সৌরজগত জন্ম নেবে –ভালো কিংবা মন্দের জন্য। মোটামুটি এই ছিল তার বিষয়। নাটকটি পরিচালনা করেছিল আলীজাহ্ নিজেই। ভূমিকায় জরিনা, নূরুন্নাহার দুজনকেই দেখা গেছে। জরিনাকে আলীজাহ্ বলেছিল–তুই যে চরিত্রটা করতে যাচ্ছিস রিনু, সেটা খুব কঠিন। কিন্তু তোর কাছে খুব সোজা হবে। তুই শুধু ঢাকা আসবার পথে ট্রেনে সেই ছুঁড়ে দেয়া চুনের পানিতে বউটার অন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা মনে কর। ঠিক ওই মুহূর্তে তোর মুখটা যেমন হয়েছিল, তোর বিবেক যা বলছিল –ঠিক সেই মুখ, সেই ভাবনাটা আমি চাই।

নাটকের উপস্থাপনাও ছিল তেমনি পরীক্ষামূলক, তেমনি নতুন। গোটা মঞ্চ আলাদা আলাদা উচ্চতায় তিনটে ভাগে ভাগ করা ছিল। আর পেছনে আকাশ থেকে ঝোলানো ছিল ধূসর রঙের ড্রেপারি একটা অর্ধবৃত্ত সৃষ্টি করে। সবচেয়ে নিচের তল ছিল মিহি নীল, মাঝের তল সবুজ আর ওপরের তল গোলাপি আলোয় উদ্ভাসিত। রংটা ঠিক বোঝা যাবে না যতক্ষণ না কোনো শিল্পী এসে দাঁড়াবে। একেকটা দৃশ্য অভিনয় চলছিল একেক তলে। সব শেষের দৃশ্যে তিনটে তলেই একসঙ্গে তিনটে দৃশ্যের সম–উপস্থাপনা করা হয়েছিল।

বিদগ্ধ মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু লক্ষ্য যার চলচ্চিত্র সে তৃপ্ত হতে পারল না নাটকের মাধ্যমে তা আসুক না খ্যাতি, আসুক না প্রতিষ্ঠা। আলীজাহ্ লাহোরে চলে গেল। বেনামিতে শস্তা কাহিনী, চিত্রনাট্য লেখা চলল, আর অনুসন্ধান চলল এমন এক প্রযোজকের যে আলীজাহ্ ইচ্ছে মতো আলীজাকে ছবি তৈরি করতে দেবে।

জরিনা বলেছিল, ঢাকায় থেকে যাও, আলীচাচা। লাহোক্সে গিয়ে মনের মতো ছবি বানালেও তো বানাবে উর্দুতে। তারচে আমার মনে হয় বাংলাতে নাটক লেখা ঢের ভালো।

আলীজাহ্ তখন বলেছে, দ্যাখ, চলচ্চিত্র হচ্ছে প্রথমে প্লাস্টিক আর্ট, তারপরে অন্য কিছু। ভাষা এখানে একেবারেই গৌণ। যে কোনো ভাষাতেই ছবি হোক না কেন, আসলে তা ছবি হওয়া চাই, পূরণ করা চাই প্লাস্টিক আর্টের, চলচ্চিত্র মাধ্যমের শর্তগুলো।

অবশেষে অনেক কাল পরে, অনেক বাজে ছবি লিখবার পরে, আলীজাহ্ মাস চারেক আগে ছবি করবার একটি সুযোগ পেল লাহোরে। সুযোগ মানে, কষ্ট হবে, পারিশ্রমিক মিলবে না, পাই পাই হিসেব করে কাজ করলে তবে ছবি হবে। অর্থাৎ মূলধন অতি সামান্য। ভিক্ষের মত করে প্রায় চেয়ে নেয়া লাখ খানেক টাকা। তিনজনের কাছ থেকে অঙ্কটা এসেছে।

বছরের পর বছর মুখে থুতু উঠিয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বুঝিয়ে, রাজি করিয়ে যখন মূলধনটা পাওয়া গেল তখন আলীজাহ্ তার যৌবন ফিরে পেল যেন–যে যৌবন, হিসেব করতে বসলে, পৃথিবীর চোখে অনেকদিন আগেই চলে গেছে।

বছরের পর বছর ধরে খেটেখুটে তৈরি করা চিত্রনাট্যটাকে বার করলো। কত রাত গেছে এর পৃষ্ঠা খুলে। কল্পনার পর্দায় নিজের বানানো ছবি তৃষিতের মত সে দেখেছে, একেবারে শুরু থেকে, যেখানে ফেড ইন করছে জরিনার কবিতা থেকে উদ্ধৃতি–

Beneath the black sun
We shall rise in a flame.

এত বিশদ করে, ধারাবাহিকভাবে সে প্রতিটি শট দেখেছে যে বানানোর আগেই তার মনের ভেতরে ছবিটি অনেকদিন আগে বানানো হয়ে গেছে।

সেদিন রাতে সে শাহ সাদেক আলীকে লেখল সুসংবাদ। সাদেক ফেরৎ ডাকেই লিখলেন, সাধনার সিদ্ধি অনিবার্য এ ছিল আমার চিরদিনের বিশ্বাস।

আর জরিনা, সে লিখেছিল– ইস, আমার যে কী খুশি হচ্ছে আলীচাচা তোমার চিঠি পেয়ে। জানো, ভীষণ হিংসে হচ্ছে তোমাকে। পৃথিবীর কাছ থেকে নিজের পাওনা আদায় করে নিতে পারলে তাহলে। আমি কিন্তু অন্ধকারেই রইলাম। তোমার উদাহরণ আমাকেও খুব সাহস দিচ্ছে। আমি জানি, তুমি যে ছবি করবে তা শুধু ছবি হবে না, হবে সৃষ্টি, তুমি হবে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী। জয় হোক তোমার।

ছবি তৈরির প্রায় সবগুলো কাজ এক অমানুষিক ধৈর্য আর পরিশ্রমের ভেতর দিয়ে করে চলল আলীজাহ্। তিনমাসে বইয়ের দুতৃতীয়াংশের কাজ শেষ হলো। ইতিমধ্যে মূলধন এলো ফুরিয়ে। প্রযোজক হারুণ সাহেব বললেন, আলী, যতটুকু কাজ হয়েছে, এডিট করে কোনো ডিস্ট্রিবিউটারকে দেখাই। নইলে আমাদের পকেট থেকে কামান দাগলেও আর এক আধলা বেরুবে না।

ঠিক এ ধরনের একটা পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না আলীজাহ্। আজীবন প্রতীক্ষার পর হাতের কাছে এসেও বুঝি আকাঙিক্ষত ফিরে যায়। এক মিনিটের জন্য সে স্তব্ধ হয়ে

বসে রইলো হারুণ সাহেবের বাসায় সাজানো ড্রইংরুমে একটা অতিকায় পুতুলের মতো। পরে বলল, আচ্ছা, তাই হবে।

একজন অবতারের অন্তর ছিল আলীজাহ্। যে সন্দেহ, যে ভয় সে করেছিল তাই ঘটলো। সেই দুতৃতীয়াংশের কাজ মোটামুটিভাবে দাঁড় করিয়ে লাহোরের সমস্ত ডিস্ট্রিবিউটরকে একে একে দেখানো হলো। সবাই এক রোল দেখেই দরোজা খুলে বেরিয়ে গেল। কেউ বলল– সমঝ মে নেহি আতা! কেউ বলল–বাকোয়াস, বাণ্ড। আবার কেউ বলল ডাইরেকটর সাব কহি পাগল তো নেহি হ্যাঁয়? পহলা ডকটরকে পাস যাও– ডকটর।

সবার কাছে এই একই কথার নানা রূপ শুনে হারুণ সাহেব আলীজাকে গম্ভীর হয়ে বললেন, এ রকম হলে তো চলবে না। টাকা খাঁটিয়ে টাকাই যদি না পেলাম, তাহলে টাকাগুলো রাভি নদীর পানিতে ফেলে দেয়াই বেহতর। তাতে তবু সান্ত্বনা থাকবে, সাদকা দিয়েছি, অক্ষয় পুণ্য হবে আমার।

হাল ছেড়ে দিল না আলীজাহ্। বলল, ঠিক আছে আমি করাচি যাচ্ছি, দেখি সেখান থেকে কাউকে পাই কিনা।

হাতে তেমন টাকা নেই; তবু, করাচি গিয়েছিল সে। পুরো পনেরো দিন দরোজায় দরোজায় ঘুরছে। কিন্তু সেই একই উত্তর, একই ব্যবহার মিলেছে। লাহোরে পা দিতেই হারুণ সাহেব বললেন, আলী, এখনো হুশ হোক তোমার। ভেবেছ, মাথা নিচু করে বসে

থাকলেই সব সমাধান হয়ে যাবে? তা তোমার জন্যে হতে পারে। কিন্তু আমরা কী তোমার নেগেটিভ থেকে নেলপলিশ বানিয়ে বাড়ি ফিরবো?

আলীজাহ্ বলেছে, কিন্তু ব্যবস্থা তো একটা করতেই হবে। এখন আপনি বা আমি কেউই ছবি ফেলে রাখতে পারি না।

নিশ্চয়ই। ব্যবস্থা তো করতেই হবে। আমি বলি, তুমি একটা নাচ আর একটা ড্রিম সিকোয়েন্স দাও। শেষ সেটের সিনগুলোতে কমেডিয়ান কাউকে রাখা যায় না? তাহলে দেখবে সব ব্যাটারই ঘর থেকে সুড়সুড় করে টাকা বেরিয়ে আসছে। এটাই করো।

নিজের মাথাটা কেউ পিস্তল দিয়ে উড়িয়ে দিলেও এতটা বিমূঢ় হতো না আলীজাহ্। যে আপোষ সে করবে না বলে এতকাল ভাগ্যের হাতে মার খেয়েছে, সহ্য করেছে, সেই আপোষ কি তাকে শেষ অবধি করতে হবে? কীসের অভাব ছিল তার। ইচ্ছে করলে জনপ্রিয় নায়ক হতে পারত, বহু সংস্করণওয়ালা বইয়ার লেখক হতে পারত, সরকারের সব সেরা পদের বেতনভোগী সেবক হতে পারত, সংসার করতে পারত–বউ ছেলে, মেয়ে, বাড়ি, গাড়ি, সবই হতে পারত তার। তার সঙ্গের যারা তারা তার চেয়ে কম সুযোগ, কম মেধা নিয়েই, বিষয়ীদের চোখে, অনেক উন্নতি করেছে। আর সে? এমনকি বুকের ভেতরে যন্ত্রণাকর একটা বিরাট ক্ষত, আর কেউ জানুক বা না জানুক, এই জিদ থেকেই সে সইতে পেরেছে। জরিনাকে নিয়ে গিয়েছিল যে মহিলার জন্মদিনে, সেও তো বলেছিল আমি তোমার কথা পুরো বিশ্বাস করি, তুমি আমাকে ভালোবাসো; কিন্তু এ–কী সর্বনাশা নেশা তোমার? শিল্প করবে, কিন্তু না খেয়ে শিল্প? পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে

আলো–অন্ধকারের সঙ্গে আপোষ করেই বেঁচে থাকতে হয়। সেটাকে অস্বীকার করে শুধু নিজে কষ্ট পাবে, পৃথিবীর তাতে একটুও এসে যাবে না।

আলীজাহ্ ভালোবাসাকেও তাই সইতে হয়েছে বিচ্ছেদ। ক্ষত হয়েছে। তা হোক। ক্ষত আমার ফুল।

না, আলীজাহ্ আপোষ করবে না।

হারুণ সাহেবের কাছ থেকে ফিরে এসে, সেদিন নিজের ঘরে টেবিলে মাথা রেখে, জীবনে এই প্রথম আলীজাহ্ কেঁদেছে।

পরপর চারদিন সে বোঝালো হারুণ সাহবেকে। কিন্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে তারো গোঁ। বলেছেন, যা বলছি তাই করো। পাগলামি কোরো না। জানো কিছু –লোকমান সাহেব একলাখ টাকা নিয়ে তৈরি, শুধু দু–তিনটে সিন ঢোকানোর যা ওয়াস্তা। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করো, আলী। তোমার জন্যে আমরা ভুখা মরব কেন?

পৃথিবী জুড়ে শিল্পীর জন্য এই একই জবাব। কোনো বদল নেই, কোনো নতুনত্ব নেই। সেই একই অভিযোগ তোমার জন্য আমি কেন মরবো?

অসম্ভব, আমি পারবো না।

তাহলে কী আমাকে অন্য পরিচালক ডেকে বই শেষ করাতে হবে?

হারুণ সাহেবের কণ্ঠ ছিল শীতল, নিষ্ঠুর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আলীজাহ্ ঘুরে তাকায়নি তার দিকে তখন মঞ্চে যা সে হয়ত নিজেই নির্দেশ দিত করবার জন্য, যদি এই ঘটনাটা দেখানো হতো মঞ্চে। সেই মহিলার মুখ অস্পষ্ট দেখা যায় যেন স্মৃতির পটভূমিতে। কিন্তু ভালোবাসতে বাসতে চলে আসা যায়, সৃষ্টি করতে করতে সরে যাওয়া যায় না–অন্তত আলীজাহ্ তা পারবে না।

তার আগে আমি আমার নেগেটিভ জ্বালিয়ে দেব। হবে না, আমার ছবি হবে না, আমি ছবি করবো না।

বিলাপের মতো শুনিয়েছে আলীজাহ্ কণ্ঠ। বিলাপটা মাথার ভেতরে, বুকের ভেতরে, কয়েকদিন ঝড়ের মতো মাথা কুটে মরেছে তারপর।

পড়ে থাক ছবি, ডুবে যাক তার প্রতিভা, করুন হারুণ সাহেব তার ছবি শেষ, আলীজাহ্ মরে গেছে। মরে গেছে নিজের কাছে, পৃথিবীর কাছেও।

এতদিন ছবি করিনি, তার ছিল জ্বালা। কিন্তু ছবি করতে করতে ফিরে আসা, নিজের সৃষ্টিকে কলঙ্কিত হবার জন্য তুলে দিয়ে আসতে বাধ্য হওয়া এবং কিছুই করতে না পারা–এ যন্ত্রণা মৃত্যুর, এর প্রাপ্তি অন্ধকার।

ছবি করতে করতে ছবির সঙ্গে তার হৃদস্পন্দন একতারে বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। আজ তাই আর মমতা নেই নিজের ওপর। যত নিষ্ঠুরতা থাকতে পারে সব এখন ডেকে আনা চলে নিজেকে চূড়ান্ত রকমে পীড়িত করবার জন্য; নিজের জন্য যে কোনো অবহেলা যে কোনো ক্ষতি।

৬. শাহ সাদেক আলী বই পড়ছিলেন

শাহ সাদেক আলী বই পড়ছিলেন। বই রেখে বললেন, এসো, এসো।

আলীজাহ্ তার সম্মুখে বসলো। তখন সাদেক রোকসানাকে বললেন, ওকে কিছু খেতে টেতে দাও। এখানেই দাও। তারপর আলীজাহ্ দিকে তাকিয়ে, জরিনা সেই বিকেলে বেরিয়েছে। বলেছিলাম ওকে। যায়নি বুঝি এয়ারপোর্ট? তা তোমাকে এত ক্লান্ত দেখছি কেন, আলী?

শরীরটা বিশেষ ভালো নেই।

উদ্বিগ্ন হলেন সাদেক।

ডাক্তার করিয়েছো?

এমন কিছু নয়।

সাদেক বইয়ের পৃষ্ঠায় আবার কিছুক্ষণের জন্য মন দিলেন। কিন্তু চোখ থাকলেও মনটা সেখানে রইলো না। মন রইলো আলীজাহ্ দিকে –তারই সহোদরের দিকে, বাবার মৃত্যুর পর যাকে তিনি সন্তানের মতো মানু করেছেন, প্রশ্রয় দিয়েছেন, বাহু দিয়েছেন। শাহ সাদেক আলী কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না –জরিনার মা সেটা বুঝতো–তাই

হাজারো কষ্ট দিয়ে হাজারো জ্বালাতন করেও নিশ্চিন্ত নির্ভর থাকা যেত, যে, মানুষটা তাকে ভুল বুঝছে না। আর রোকসানা? রোকসানা কোনদিন মুখ ফুটে কিছু না বললেও সাদেক ইন্দ্রিয়বুদ্ধি দিয়ে প্রথম দিনেই জেনে গেছেন, এ হচ্ছে আলাদা জাতের মানুষ। এদের জন্য মমতা প্রকাশ না হলে ক্ষুণ্ণ হয়, অসহায় বোধ করে। তাই সাদেক যথাসম্ভব মাঝে মাঝে রোকসানাকে এ ক্ষুণতা থেকে, এ অসহায়ত্ব থেকে, নিজের মেজাজ অনুযায়ী মুক্তি দিতে চেয়েছেন। নতুন বাড়িটাও ঠিক এমনি একটা প্রকাশ। জরিনার মা হলে দরকারই পড়ত না হয়ত, কিংবা হয়ত সে নিজেই বাধা দিত। বলত–এত খরচ করে এটা না বানিয়ে, ছোটমোট একটা বাড়ি কর, তাতেই চলে যাবে। কিন্তু রোকসানা সেটা বুঝতো না। রোকসানাকে কিছুটা প্রীত করবার জ, তার জন্য তো সাদেক কিছুই করেননি হাতের সবকটা টাকা ঢেলে বাড়িটা বানিয়েছেন তিনি। কতটা কষ্ট হয়েছে তাঁর, সে কথা অনুক্তই রেখেছেন রোকসানার কাছে। আর এই যে তার সম্মুখে বসে থাকা আলীজাহ্ সে? সেও ঠিক জরিনার মায়ের দলের মানুষ যেন। তার জন্য নিজের গভীর মমতা বোঝাবার মতো চোখে দেখা যায় এমন কিছুই করতে হয় না। ইচ্ছে করলে তো তিনি মন্ত্রী থাকাকালে আলীজাহ্ জন্য অনেক কিছু করতে পারতেন– শুধু ব্যবসায়ী, লাখপতি, কোটিপতি কাউকে বলে দিলেই হতো। কিন্তু সেটা হতো তার ব্যক্তিগত জীবন আদর্শের মুখে কলঙ্ক মাখিয়ে–আলীজাহ্ এটা বুঝতে পারতো। তাই বছরের পর বছর কষ্ট করেছে, আর্থিক অনটনে নিরন্তর বিব্রত হয়েছে, কিন্তু ক্ষুণ্ণ হয়নি নাদেকের ওপর। নিজের বিবেক এবং কর্মকে কলুষিত না করতে পারার মহত্বটুকু আলীজাহ্ মনে প্রাণে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু আলীজাহ্ তো এ রকম হবেই –শাহ সাদেক আলী মনে মনে এখন ভাবলেন—কারণ ও আমার ভাই। নিজের রক্তের ভেতরে আলীজার জন্য নতুন করে তীব্র একটা টান,একটা জোয়ার অনুভব করলেন শাহ সাদেক আলী।

রোকসানা তসতরিতে কিছু ফল কেটে আর নেবুর শরবৎ নিয়ে ফিরে এলো। এসে আলীজাহ্ সম্মুখে টিপয় টেনে সাজিয়ে রাখলেন। বলল, খান।

ভাই?

সাদেক বইয়ের ওপর চোখ রেখেই বললেন, তুমি খাও।

আলীজাহ্ খেতে শুরু করলে তিনি বই নাবিয়ে একজোড়া পূর্ণ চোখ স্থাপন করে তার খাওয়া দেখলেন। ঈষৎ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালেন, তোমার সব খবর ভালো তো, আলী?

উত্তরে আলীজাহ্ মাথায় ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কী বোঝাইতে চাইলো তা অস্পষ্টই রয়ে গেল। তাতে কিছুটা বিরক্তি বোধ করলেন শাহ সাদেক আলী। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এত তাকে অপরের একেকটা এমনি অস্পষ্ট ভঙ্গি থেকে অর্থ উদ্ধার করতে হয়েছে যে পারিবারিক ক্ষেত্রে সেটা তিনি করতে রাজি নন। সেই বিরক্তিটা দমন করতে একটু সময় লাগলো। অবশেষে বললেন, মনে হচ্ছে শারীরিক কুশল। ঢাকায় কি কিছু কাজ ছিল?

না।

তাহলে আর কী কারণ থাকতে পারে?–শাহ সাদেক আলী চোখ তীক্ষ্ণ করে তার মুখ দেখে কারণটা অনুমান করতে লাগলেন। পরিবারের জন্য মায়া আছে তার, কিন্তু আলীজাহ্ কখনো সে জাতের মানুষ নয় যে কাজ ফেলে সেই মায়ার টানে ছুটে আসবে। অনেকটা ঠিক তার নিজের মতো। এছাড়া, জরিনার এয়ারপোর্টে না যাওয়াটাই নিয়মের ব্যতিক্রম বলে মনে হচ্ছে তার। তিনি তো বিকেল বেলায় নিজে বলেছিলেন জরিনাকে, তাকে বেরিয়ে যেতেও দেখেছেন তিনি, তবু সে গেল না কেন? তাহলে কি জরিনার সঙ্গে আলীজাহ্ এই হঠাৎ করে চলে আসার একটা অনুক্ত সম্পর্ক রয়েছে? কেমন যেন ওলোটপালোট মনে হয় তাঁর। মনে মনে এই সবের আলোড়ন চলতে থাকে।

কিন্তু বাইরে তা বুঝতে না দেওয়ার জন্য কথা বলতে লাগলেন, বাড়িটা হয়ে গেছে শুনেছ বোধ হয়? ভালোই হলো তুমি এসেছ। তোমার ভাবী বলছিলেন, নতুন বাড়িতে যাবার আগে তোমাকে একবার আনাতে।

রোকসানা বসে ছিল পাশেই। মাথার ওপরে ঘোমটার ঘের টেনে দিতে দিতে সে তখন যোগ করল, একটা ছোট খাটো কিছু করব ঐদিন।

বলেই সে উৎসুক চোখে সস্মিত মুখে তাকাল আলীজাহ্ দিকে। কিন্তু আলীজাহ্ তার জন্য কিছু বলতে পারার আগেই সাদেক প্রশ্ন করলেন, তোমার ছবি কি শেষ হয়ে গেল?

তখন ঋজু হয়ে বসলো আলীজাহ্। নিঃশেষে চুমুক দিয়ে শরবতের গ্লাশটা নাবিয়ে রাখল টিপয়ে। বলল, না। আমি করছি না। আমি আর ছবি করবে না।

বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কাউকে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে, পেছনে পাথরের মতো দুটো স্তব্ধ মুখ রেখে, বারান্দায়।

আলীজাহ্ এ অসৌজন্যতা একেবারেই আকস্মিক।

.

তখন থমথম করতে লাগল সারাটা বাড়ি। শাহ সাদেক আলীর মন ভীষণ রকমে বিক্ষিপ্ত, বিস্মিত হয়ে রইলো। রোকসানা না বসতে পারলো তার কাছে, না যেতে পারল আলীজাহ্ কাছে। তার মনে হলো, এক মুহূর্তে দুভাই তার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। দুভাইয়ের ভেতর এমন একটা ভাবের বিনিময় হয়ে গেছে, যেখানে সে নিতান্তই বাইরের। তার ভয় করতে লাগল। শোবার ঘরে এসে তখন চুপচাপ বসে রইলো রোকসানা।

শাহ সাদেক আলী স্থাণু হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। অনেক ঝড়ের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি, কিন্তু কোনদিন এতটা দোলা লাগেনি তাঁর আত্মায়। সারাটা জীবনে যে রকমটি দেখা যায়নি তাকে, আজ তাই প্রত্যক্ষ করা গেল। বিব্রত হয়ে, বিচলিত হয়ে, স্পষ্ট রকমে নিজের ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করে তিনি আলীজাহ্ কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বারান্দার অস্পষ্ট আলোতে দাঁড়িয়ে আছে আলীজাহ্। তার ঈষৎ আনত মুখ, টান টান মেরুদণ্ড আর রেলিংয়ে প্রসারিত দুই বাহু– সব মিলিয়ে একটা অচেনার আভাস সৃষ্টি হয়েছে। মনের চঞ্চলতাকে দমন করে শাহ সাদেক আলী কণ্ঠে আওয়াজ তুললেন, আলী আমার সঙ্গে এসো।

ঘরের ভেতরে আবার দুজনে মুখোমুখি বসলো। আলীজাহ্ চোখের ভেতরে বহুক্ষণ দৃষ্টি রেখে সাদেক যেন সম্মোহিত করলেন তাকে। বললেন, ওভাবে উঠে যাওয়াটা আমি পছন্দ করিনি।

তখন ছবি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সবটুকু ইতিহাস সবিস্তারে শুনলেন সাদেক। শুধদলেন, তা এখন কী করবে ঠিক করেছ? কিছুই না।

এটা হলো অভিমান। সমস্যার সমাধান তো হলো না।

চাইনে আমি।

তাহলে এত লড়াই করলে, সব কি মিথ্যে ছিল?

উত্তরে সাদেকের দিকে বড় সরাসরি তাকাল আলীজাহ্। এমন করে কোনদিন তাকে তাকাতে দেখেননি তিনি। আলীজাহ্ বলল, অল কোশ্চেন আর ডেড টু মি নাও।

বাংলায় বলো, তিরস্কার করলেন শাহ সাদেক আলী। রূঢ় শোনাল হয়ত কিন্তু ওকে সাহস দিতে হবে আমার, বন্ধুর পথে চলার দীক্ষা দিতে হবে–মনে মনে বললেন তিনি। তারপর কণ্ঠে যতটুকু সম্ভব মমতা মাখিয়ে বললেন, লক্ষ্য থেকে যারা সরে যায় তাদের আমি ঘৃণা করি। লড়াই করতে যারা ভয় পায়, হাত পা গুটিয়ে আনে, তাদের মরে যেতে বলি। একটা দেশের কথা ধরো, একটা জাতির কথা ধরো, একটা মানুষের কথা ধরো– সবার জন্যে যে জীবন দিয়েছেন আল্লাহ, তার মূল্য কি তোমার ভয়, তোমার অভিশাপ দিয়ে মাপা হবে। জীবন একটা মহৎ শক্তির নাম। জীবনের সার্থকতা সংগ্রামে। যে মুহূর্তে তুমি সগ্রাম থেকে হটে গেলে সে মুহূর্তে জীবন থেকেও বঞ্চিত হলে তুমি।

উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিলেন সাদেক। চেয়ারের হাতলে বাঘের থাবার মতো পাঁচটা আঙুল দৃঢ় হয়ে উঠেছে। কপালে দেখা দিয়েছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আলীজাহ্ প্রায় চিৎকার করে উঠলো, জানি। আমি জানি।

কী! কী জানো তুমি?

ফাঁপা ফাঁপা এইসব কথার কী মূল্য?

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সাদেক। এই কি সেই আলীজাহ্ যাকে তিনি অমিত স্নেহে মানুষ করে তুলেছেন। এই চিৎকার করা, ক্ষুদ্রাত্মা, অজ্ঞান মানুষটা?

আলীজাহ্‌কে তখন যেন ভূতে পেয়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে সে বলতে লাগল, কানাকড়ি দাম দেব না আমি আপনার কথার। আপনি নিজে কী করেছেন? কোথায় গেল আপনার সংগ্রাম? আপনার লক্ষ্যের জন্য নিষ্ঠা? নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন। বলুন আপনি নিজেকে এই কথাগুলো। কেন হাত গুটিয়ে বসে আছেন? মন্ত্রিত্ব যাবার পর, ইলেকশানে আপনাদের সেই জাতীয় পার্টি হেরে যাবার পর, দিস্তে দিস্তে অসার বিবৃতির বকুনি ছাড়া আর কী করেছেন আপনি? কোথায় আপনার আদর্শ? দেশের মানুষ আজ নীলামে যেতে বসেছে, আপনার সাধের পাকিস্তান তার রাজস্ব দিয়ে কতগুলো লোলুপ মানুষের বাড়ি গাড়ি ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স জোগাচ্ছে, মন্ত্রিত্ব মানে আজ টাকা বানাবার গদি হয়েছে–আর আপনি ড্রইংরুমে বসে দুঃখ করছেন। অতিথিদের সঙ্গে আজ দুঃখ করা পর্যন্তই আপনার সংগ্রামের দৌড়। কেন আমাকে বলছেন এই কথাগুলো যা আপনার কাছেই মিথ্যে?

আলীজাহের কণ্ঠ কখন উঁচু পর্দায় গিয়ে পৌঁছেছে তা সে জানে না। রোকসানা ছুটে এলো এ ঘরে।

কী হয়েছে? কী হলো?

কিছু না। আলীজাহ্‌ চুপ করলো। চুপ করে বিসদৃশ রকমে দাঁড়িয়ে রইলো। হাতটা তখনো তার শূন্যে ঝুলছে, যা সে একটু আগেই তুলেছিল শাহ সাদেক আলীর দিকে।

রোকসানা তার দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ফেরাল সাদেকের দিকে। সাদেক তখনো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন আলীজাহ্ দিকে। রোকসানার উপস্থিতি যেন তিনি অনুভবই করতে পারছেন না।

অনুতাপ হলো আলীজাহ্। সংম্বিৎ ফিরে পেলো সে। অনির্দিষ্ট চোখে একবার সাদেকের দিকে তাকাল। কিছু একটা বলতে চাইলো কিন্তু পারল না। বদলে, আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো। এত আস্তে যেন তার সমস্ত শক্তি অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

.

খাবার টেবিলে এলো না আলীজাহ্। তার ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিল রোকসানা, সেটাও পড়ে রইলো।

জরিনা এলো রাত এগারোটা তখন। জরিনাকে ফটক পেরিয়ে আলো অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আসতে দেখে আলীজাহ্ প্রসন্ন হয়ে উঠলো মনে মনে। এতক্ষণে যেন সে অনুভব করতে পারল, সত্যি সত্যি সে ঢাকা এসেছে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে আলীজাহ্ জরিনার কাঁধে হাত রাখল, বলল, টমবয় হয়েছিস, না? এত রাত করে আড্ডা মারতে শিখেছিস।

জরিনা কিছু বলল না। চোখ মাটির দিকে রেখে মাথা নাড়লো, যেন স্প্রিং দেয়া পুতুল। আলীজাহ্ শুধালো, ঘুম পাচ্ছে?

হুঁ।

চল তোর ঘরে। এয়ারপোর্টে যাসনি যে আজ?

জরিনার ঘরের দিকে যেতে যেতে পরিহাস কণ্ঠে আলীজাহ্ উচ্চারণ করল। ঘণ্টা কয়েক আগে যে সে বিশ্রী একটা দৃশ্য করেছে, তার লেশমাত্র এখন তার ভেতরে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ঘরে এসে বিছানার ওপর ধপ করে বসে পড়ল জরিনা। তারপর হেসে ফেলল। সুন্দর, বিলম্বিত হাসি।

এলে তুমি আলীচাচা। আমি মনে করলাম, তুমি বুঝি আসবেই না।

ঠাট্টা করেছি তাহলে টেলিগ্রাম করে?

হুঁ-উ। নইলে আমার মনে হলো কেন আসবে না?

আলীজাহ্‌ও হেসে ফেলল তার কথা বলবার ধরন দেখে। আদুরে একটা ছোট্ট মেয়ের মতো পা দোলাতে দোলাতে গলায় টান তুলে কথা বলা হরিনাকে তার ভীষণ ভালো লাগল।

ছিলি কোথায়?

কোথায় ছিলাম? এক, বিকেলে নতুন বাড়িতে। খুব বিষ্টি হয়েছিল। তারপর। গিয়ে দেখি সোলেমান সাহেব মেঝেয় পড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। কাজে ফাঁকি–বুঝলে?

কে?

নতুন বাড়ি সাজানোর জন্যে যে ভদ্রলোক। মজার কাজ।

ও–হো। তারপর?

খুব বকুনি দিলাম! ফ্যালফ্যাল করে তখন, জানো, আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। যেন আমাকে চিনতেই পারছে না।

ফাজলামো রাখ।

বেশ।

গম্ভীর হয়ে গেল জরিনা! তার পর আবার সেই হাসিতে ভেঙ্গে পড়া।

তারপর সেখান থেকে ব্রিটিশ কাউন্সিলে গিয়ে বই পড়লাম। খুব শক্ত বই। কী যেন নাম?

বাজে কথা!

সত্যি।

তারপর বেরিয়ে–কী করলাম। বেরিয়ে কী করলাম যেন?

জরিনা মাথা কাত করে তেরচা চোখে ভাবতে চেষ্টা করল। এ ভঙ্গিটা আলীজাহ্ খুব চেনা। ভঙ্গিটি যেন আরো আপনার একটা ঝির সৃষ্টি করলো তার ভেতরে।

হ্যাঁ, সিনেমা দেখতে গেলাম। দেখতে দেখতে মনে হলো আজ না তুমি আসছো, এতক্ষণ এসে গেছ?

আলীজাহ্ হঠাৎ তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলল, তুই ড্রিংক করেছিস?

না, না।

রিনু।

আলীজাহ্ অবাক চোখে তাকাল জরিনার দিকে। কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে কপালে রেখে শুধালো, কতটা খেয়েছিস?

অল্প একটু।

ছি, ছি। কেন খেয়েছিস? রোজ খাস।

না।

কে শেখালো?

কেউ না।

তবে?

শুধু আজ। এই একটু। এক্সপেরিমেন্ট করলাম। লোকে বলে না ড্রিংক করলে দুঃখ থাকে না? তোমাদের শরত্যাবু একটা মিথ্যুক। নইলে আমার আরো কান্না পেল কেন?

আলীজাহ্ তাকে শুইয়ে দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু শোবে না জরিনা।

ইস এত বিশ্রী লাগছে আমার। আমাকে এক্ষুণি সারিয়ে দিতে পারো না। আমি এখন চিৎকার করব কিন্তু।

চুপ, চুপ।

তখন আলীজাহ্ ওকে বাথরুমে নিয়ে মাথায় পানি ঢেলে দিল অনেকক্ষণ ধরে। বলল, গা ছুঁয়ে বল, আর কখনো খাবিনে। তুই যে একটা কী হয়েছিস?

বকছ কেন?

মাথায় পানি ঢালবার পর কিছুটা ভালো লাগে জরিনার। নিজেই তখন তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে থাকে। আর আলীজাহ্ তাকে নতুন করে নতুন চোখে দেখে। নিজের সঙ্গে একটা অলক্ষিতের মিল খুঁজে পায় যেন। মনে হয়, তারই একটা অংশ কোন জন্মান্তরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, আজ আবার ফিরে এসেছে।

কী আশ্চর্য, জরিনারও তখন এই কথাটা মনে হচ্ছিল। আলীজাহ্ এই মাণিকের মতো চোখের তারা দুটো মাঝে মাঝে কোন এক অজানা দীপ্তির স্পর্শে এমনি বিচ্ছুরিত হয়। মনে পড়ে তার। শিথিল নদীর একটা ঠাণ্ডা স্রোতের মতো শিথিলতা ছড়িয়ে পড়ল তখন জরিনার শরীরে। মনে মনে উচ্চারণ করল– আলীচাচা।

ব্যক্তিগত, শুভ্র, দীপ্ত একটা শিখার মতো আলীজাকে মনে হয় তার। তীব্র একটা টান জেগে ওঠে বুকের ভেতরে। কোন এক অজ্ঞাত অপরাধের কারণে একই আত্মাকে আল্লাহ দুটো শরীরে বন্দি করে রাখলেন?–ভাবতে ভাবতে একটা অদ্ভুত একাগ্রতার ভেতরে ডুবে গেল জরিনা।

আলীজাহ্ জরিনাকে বলল, কাছে আয়। বোস।

জরিনা বসলো। বলল, সামান্য একটু খেয়েছি তাই এত মাশুল দিতে হচ্ছে।

খাসনে– কখনো খাসনে। আজ আমাকে খুব চমকে দিয়েছিস তুই। আমি না এলে কী হতো বলত?

কী হতো আর? বাবা বিশ্বাস করতেন না। আর বাবার স্ত্রী উঠে পড়ে লাগতেন তাকে বিশ্বাস করাবার জন্যে।

দূর পাগলি।

জরিনা ঝুঁকে পড়ল আলীজার দিকে। বলল, বেঁচে থাকতে হলে, ঘৃণার সঙ্গে আপোস করতে হয়, আলীচাচা?

কেন করবি? তুই করতে পারবি না।

করতে পারলাম না। কিন্তু দুঃখ হয় যে?

হোক। তাই বুঝি মদ গিলতে গিছলি?

জরিনা হেসে ফেলে। বলে, ভুলতে পারছ না। খুব শাসন করতে ইচ্ছে করছে আমাকে? করো আলীচাচা। আমি খুব খারাপ হয়ে গেছি।

তোর আজ মতিভ্রম হয়েছে। আজ তুই আবার কথা বললে মার দেব।

কিছুক্ষণ চুপ করে বইলো দুজনেই। পরে আলীজাহ্ প্রায় ফিসফিস করে শুধালো, মাসুদ লেখে না?

ইতরটার কথা মনে করিয়ে দিও না তো।

কেন?

গভীর দুচোখে জরিনার মুখের দিকে তাকাল আলীজাহ্। আস্তে আস্তে শুধোল, তুই ঠিক বুঝতে পেরেছিস?

হ্যাঁ।

জানতাম। তুই একা থাকবার ভাগ্য নিয়ে এসেছিস।

জরিনা চোখ বুজে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাল আলীজাহ্‌কে। কত সহজে আলীজাহ্‌ বুঝতে পাবলো। প্রয়োজন হলো না কোনো ব্যাখ্যার, কোনো বর্ণনার।

ঘুম পাচ্ছে তোর?

হ্যাঁ। চোখ মেলল জরিনা। ভাবছিলাম।

না, ঘুমো তুই।

উঠে দাঁড়াল আলীজাহ্‌। জরিনা বলল, শুনবে না আলীচাচা কী ভাবছিলাম?

বল।

ভাবছিলাম, কাউকে আমার দরকার নেই। যদি কাউকে দিতে হয় নিজেকে তো এমন একজনকে দেব, যে ভালোবাসার কিসসু বোঝে না, জানে না।

হাসলো আলীজাহ্। বলল, মানে, যে ভদ্রলোক তরকারিতে পরিমাণ মতো নুন পেলেই খুশি হবে?

হ্যাঁ। রসিকতাটুকু জরিনার ভেতেরই সংক্রামিত হয়ে গেল যেন। হাসতে হাসতে সে যোগ করল, আর তা না পেলে যে আমার চুলের মুঠো ধরে নাজেহাল করবে। তাতে অনেক সুবিধে। তাতে মনটা থাকবে আমার আমার মতো যারা তাদের জন্যে।

আলীজা চুপ করে ভাবলো খানিক। একটু আগে যে হালকা হাসির রেখা মুখে ছিল তা বিলীন হয়ে গেল। জরিনার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি বুঝতে পারছি সব। মানুষ আসলে স্বর্গের মতো হতে চায়, কিন্তু পারে না। তাই কিছুদূর যাবার পর বড় বিশ্রী পতন ঘটে। তা নিয়ে দুঃখ করবি কেন?

আর করি না। এখন ভালো হয়ে গেছি। কাউকে লাগবে না আমার। বলতে বলতে আলীজাহ্‌কে জড়িয়ে ধরে হঠাৎ কেঁদে ওঠে জরিনা। সে–কী কুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না।

আলীজাহ্ তখন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। মুখটাকে দুহাতের ভেতরে নিয়ে কপালে ঠোঁটের স্পর্শ চন্দনের মতো প্রলেপ করে দেয়। বলে, লক্ষ্মী সোনা কী হলো তোর? পারবি, তুই পারবি, কেন পারবি না? শোন–শোন–দ্যাখ।

আলীজাহ্ তাকে অনেকক্ষণ ধরে সান্ত্বনা দিতে থাকে। নিজের জন্যও যেন সান্ত্বনা মিলছে তার এমনি করে। দুজনের ভেতরে কখন কী ভাবে একটা সুন্দর সেতু গড়ে ওঠে।

জরিনার তখন পরম নিশ্চিন্ত নিরাকুল ঘুম পায়। আলীজাহ্ তখন স্থাকে বিছানায় শুইয়ে বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে চলে যায়।

.

ঘুম আসে না শাহ সাদেক আলীর।

পাশে রোকসানা শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। তার মুখোনার দিকে তাকিয়ে আজ আবার জরিনার মায়ের কথা মনে পড়ে তার। কেমন ছিল দেখতে? চোখ বুজে সাদেক ভাবতে চেষ্টা করেন। নাহ্, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিও ঝাঁপসা হয়ে আসছে। কিছুতেই স্পষ্ট করে মনে পড়ে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবলি এপাশ ওপাশ করতে থাকেন তিনি। নাহ, তবু কিছু না। শুধু বেদনার মতো একটা অনুভব। তিনি আজ বড় অভাববোধ করলেন জরিনার মার।

রোকসানা চোখ মেলে সাদেকের কপালে হাত রাখে। ঘুম জড়ানো গলায় শুধোয়, ঘুমোননি?

তুমি ঘুমোও।

রোকসানা তখন আধো উঠে বসে।

আহ উঠলে কেন?

রোকসানা তবু শুয়ে পড়ে না। তখন সাদেক চাপা কণ্ঠে তিরস্কার করেন, কী হলো তোমার?

কিন্তু পরক্ষণেই মমতা ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে। রোকসানার বাহু আকর্ষণ করে শুইয়ে দেন। বলেন, এমনিতে ঘুম ভেঙে গেছে হঠাৎ। তুমি ঘুমোও।

তাঁর কণ্ঠের কোমলতা রোকসানাকে আবার ঘুমের ভেতর নিয়ে যায়। আবার সেই ভাবনাগুলো ফিরে ফিরে আসতে থাকে নিশাচর প্রাণীর মতো পায়ে পায়ে, নিঃশব্দে, তার চারদিকে।

আলীজাহ্ ঠিকই বলেছে, কোথায় গেল আমার সংগ্রাম? অতিথিদের সঙ্গে দুঃখ করা আর বিবৃতি লেখা পর্যন্তই আজ আমার সংগ্রামের দৌড়।

ধিক্কারে ভরে ওঠে মন। ক্ষমা নেই।

আমার ক্ষমা নেই। যে সাহস আমার নিজেরই নেই সে সাহস আমি আরেকজনকে দেব কী করে? লক্ষ্য থেকে আমি নিজেই দূরে, আমি লক্ষ্যের দিকে আলীকে ফেরাবো কী করে? রসুলুল্লাহর সেই কথাটা মনে পড়ল শাহ সাদেক আলীর। নিজে যা অনুসরণ করো না, করতে পারো না–অন্যকে তা অনুসরণ করতে বোলা না।

মনে মনে দরুদ পড়লেন তিনি।

আজ সারা দুপুর ধরে খাদ্য সমস্যার ওপর দীর্ঘ একটা বিবৃতি লিখেছেন। লিখেছেন, কেটেছেন, বাক্যকে আরো শাণিত করে তুলেছেন একেকটা সংশোধনের ভেতর দিয়ে। কই, তখন তো তার মনে হয়নি অসার, অন্তঃসারশূন্য, শাক্তহীন কতগুলো চমক লাগানো কথা তিনি সাজিয়ে যাচ্ছেন?

আলীজাহ্ ঔদ্ধত্যকে আর ঔদ্ধত্য বলে ভাবতে পারছেন না তিনি। ভয় করছেন তার বদলে।

শেষ প্রশ্নের কী জবাব দেব আমি?

নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সাদেক। বসলেন চেয়ারে। টেবিলের ওপর পানি রাখা ছিল। পানি দেখে তৃষ্ণা পেল তার। হাত বাড়িয়ে শিশুর মতো অনেকখানি পানি খেলেন।

যখন আমি প্রথম রাজনীতিতে নামলাম, তখন আমার পাওনার হিসেব ছিল না। মন্ত্রিত্বের স্বপ্ন ছিল না। প্রয়োজন ছিল না কোনো ক্ষমতার–আজ যার একটাও নেই বলে আমি মনে করছি কাজ করব কী করে?

কেন, যে করে আমার যৌবন থেকে কাজ করে এসেছি। তখন কোনো কিছুর আশা না করেই কাজ করেছি। আজ দেশে সামরিক শাসন চলছে, মানুষের বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, আজো আমার জন্য কাজ করবার আছে। আমার পার্টি ক্ষমতায় নেই বলে কি আমার সব শক্তিও চলে গেছে?

শাহ সাদেক আলী আত্মার ভেতরে ডাক শুনতে পেলেন–এসো, বেরিয়ে এসো। শাহ সাদেক আলী টেবিলের ওপরে ফাইলের ভেতর থেকে বিবৃতিটা বের করে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন।

আবার আমি শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামে, মানুষকে দীক্ষা দেব–ঐশ্বর্যে ভরে ওঠার দীক্ষা, সাহসের শিক্ষা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সঙ্কল্প।

রক্তের ভেতরে তারুণ্যের জোয়ার ওঠে তাঁর।

আলীজাহ্‌কে তখন আরো আপন মনে হয়। হঠাৎ বুকের ভেতরে মোচড় ওঠে তার।

সিদ্ধান্ত নিতে এক মুহূর্ত দেরি হয় না। একবার ঘুমন্ত রোকসানাব দিকে তাকিয়ে দেখেন। কাল—হ্যাঁ, কালই তিনি নতুন বাড়িটা বিক্রি করে দেবেন। টাকা নিয়ে কালই আলীজাহ্‌কে লাহোর যেতে হবে।

ফজরের নামাজ আদায় করে শাহ সাদেক আলী আলীজাহ্ কামরার কাছে এলেন। দেখা পেলেন না। এত ভোরে ও উঠেছে দেখে আশ্চর্য হলেন তিনি।

তারপর এদিকের বারান্দা ঘুরে আসতেই চোখে পড়ল–এই ভোর সকালেই আলীজাহ্ আর জরিনা ব্যাডমিন্টন খেলছে মাঠে। অস্পষ্ট আলোর ভেতরে একটা শাদা পাখির মতো কর্কটা উড়ছে, তাড়া খেয়ে ফিরে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। আর ভোরের দিকে সূর্য উঠে আসছে তার রক্তিম রাজকীয়তা নিয়ে। চারদিকের সবকিছু সেই আভায় বহ্নি হয়ে উঠেছে যেন–যে বহ্নির মতো এখনি সব আরো উর্ধ্বে উঠে যাবে–এই গাছগুলো, ফটক, বাড়ি, ল্যাম্পোস্ট সবকিছু। আর ওরা দুজন হাসছে নির্বরের মতো। লাফিয়ে উঠছে মাটি ছেড়ে সেই রহস্যময় পাখিটাকে তাড়া করবার জন্য। যেন ওরাও আরো একটু পরে পাখনা মেলে। উড়তে থাকবে।

স্বপ্নের মতো চেনা অথচ অচেনা এই ছবিটার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলেন শাহ সাদেক আলী।

.

লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা

রচনাকাল : ১৯৬১ **

www.bengaliebook.com